দাম : ৭০ টাকা

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা - ১৪২৩
২৬ সেপ্টেম্বর - ২০১৬

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ৫ সংখ্যা,
৯ আশ্বিন, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
২৬ সেপ্টেম্বর - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,
Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়

রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪
সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর :
৮৬৯৭৭৩৫২১৪
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪,
৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ৭০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

দেবীপ্রসঙ্গ
মহাশক্তির পূজা ও ঐতিহ্যময় পরম্পরা
শ্রীমদ্ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী — ১৯

উপন্যাস

সমুদ্ভাবিত অনুত্তম
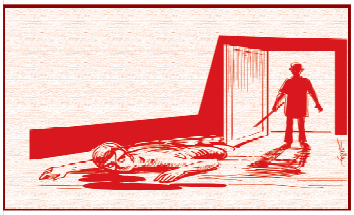
শেখর সেনগুপ্ত ৬৮

শিরিণ
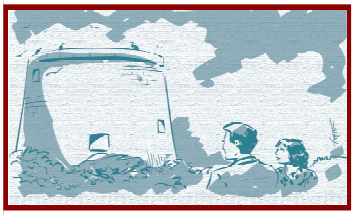
সুমিত্রা ঘোষ ১৩২

আমি মাধবী চট্টোপাধ্যায় বলছি

জিষ্ণু বসু ২৬০

গল্প

ভালোবাসার রকমফের

রমানাথ রায় ৪৩

অন্তরালে
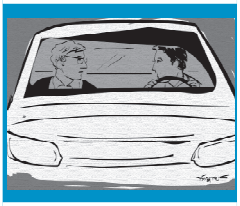
শেখর বসু ৪৯

একতলার বাসিন্দা

এষা দে ৯৯

দানবোত্থা ভবিষ্যতি

প্রবাল চক্রবর্তী ২৩

দেশান্তর

গোপাল চক্রবর্তী ২১৯

প্রবন্ধ

মীরা পঞ্চশতী

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস ৩৯

শকাব্দ : ভারতের নিজস্ব জাতীয় কালপঞ্জী

ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী ৩১

ভগিনী নিবেদিতা ও সরলাদেবী চৌধুরানি

ড. প্রণব চট্টোপাধ্যায় ৫৭

উত্তরবঙ্গের ভারতভুক্তি আন্দোলনের এক বিস্ময়কর কাহিনি

ড. তুষারকান্তি ঘোষ ১৮৩

আইনস্টাইনের ঈশ্বর ও ধর্মভাবনা এবং বেদান্ত

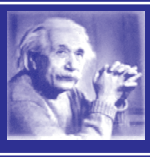

দেবীপ্রসাদ রায় ১৭৫

বিশ্বের প্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগর

অমলেশ মিশ্র ১১৫

মহারাষ্ট্রের ভক্ত-কবি পরম্পরা ও মারাঠা জাতীয় জাগরণ

রবিরঞ্জন সেন ২৩৭

ঋকবেদ ও জেন্দ আবেস্তা

রজত পাল ২৩১

ছিন্ন তমসুকের কাহিনি

অরিন্দম মুখোপাধ্যায় ১৯১

রঘু ডাকাত : রূপকথায় ও বাস্তবে

অর্ণব নাগ ২৫৩

নবাঙ্কুর (ছোটদের বিভাগ)

অমরত্ব
সিদ্ধার্থ সিংহ : ২৯৩

শব্দরূপ
শান্তনু গুড়িয়া : ৩০৫

মহাদেবের ষাঁড়
বিরাজ নারায়ণ রায় : ২৯৯

ধাঁধা
শৌনক রায়চৌধুরী : ৩০৫

রম্যরচনা

চীনের চাউমিন আমাদের চাউমিন
সুন্দর মৌলিক ২৮৫

ভ্রমণকথা

চীন থেকে ফিরে
কুণাল চট্টোপাধ্যায় ১৯৫

চরিতকথা

স্বামীজীর চারতীর্থে কুমারী পুজো
জহর মুখোপাধ্যায় ৬১

ইতিহাস

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এক স্থাপত্য - তালকাড
সৌমেন নিয়োগী ২৪৫

খেলা

বিশ্বশ্রীর মন্দিরে বেহাল দশা
জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯১

বিনোদন

অবিস্মরণীয় কমেডিয়ানরা
সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৭

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

মহাশক্তির পূজা ও ঐতিহ্যময় পরম্পরা

শ্রীমদ্ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'সাপ যখন কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে তখন পুরুষ, যখন চলতে আরম্ভ করে তখন শক্তি।' স্থিতিশীলতার মধ্যে চৈতন্যের প্রকাশ আর গতিশীলতার মধ্যে অভিব্যক্তি ঘটে শক্তির। তিনি আরও বললেন, 'তোরা যাকে ব্রহ্ম বলিস আমি তাকেই মা বলে ডাকি।' শ্রী শ্রী চণ্ডী গ্রন্থে দেবতাদের স্তবে শক্তি সম্বন্ধে অপূর্ব একটি ব্যঞ্জনা দেখা যায়—

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রীয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।

— অর্থাৎ হে দেবি, যত বিদ্যা আছে সবই তুমি আর সমস্ত মাতৃজাতি তোমারই স্বরূপ। দেবতাদের এই স্তবাংশের মধ্যে ভারতের শাশ্বত নির্মল চিন্তাধারার সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বিশেষ করে বাংলা শক্তি সাধনার পীঠস্থান।

কমলাকান্ত, রামপ্রসাদ থেকে বামাক্ষ্যাপা, শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত যেমন শক্তি সাধনার একটি ধারা নেমে এসেছে এই বঙ্গভূমিতে তেমনই আজও ছোট-বড় বহু সাধক শক্তিসাধনার ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন তাঁদের সাধনার মধ্য দিয়ে।

শক্তিমান এবং শক্তিকে অথবা পুরুষ ও প্রকৃতিকে শাস্ত্রে অভেদ বলা হয়েছে। উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি যেমন অভেদ, সূর্য ও তার জ্যোতি যেমন অভেদ এবং জল ও তার শীতলতা শক্তি যেমন অভেদ, তেমনই শিব ও তার শক্তি দুর্গা ও কালীও অভেদ তত্ত্ব। দাহিকা শক্তিকে বাদ দিয়ে যেমন অগ্নির কল্পনা করা যায় না, জ্যোতিকে অস্বীকার করে যেমন সূর্যের চিন্তা অবাস্তব, তেমনই মহাশক্তি স্বরূপিণী, দুর্গতিনাশিনী, অসুরদলনী জগজ্জননী দুর্গাও শান্ত, অদ্বৈত, সর্বমঙ্গলকারণ, কল্যাণপ্রদ শিবের থেকে স্বতন্ত্র নয়। যখন শান্ত তখন শিব আর যখন ক্রিয়াশীল তখনই দুর্গা বা কালীর প্রকাশ।

'কেন' শ্রুতিতেও সেই মহাশক্তির আবির্ভাবের কথা, তাঁর প্রভাব ও কৃপার কথা পাই। দেবতারা অসুরদের যুদ্ধে পরাজিত করে আনন্দ উৎসব করছেন। কিছুটা শৌর্যবীর্য বা বলের অহঙ্কারও তাঁদের প্রভাবিত করেছে স্বাভাবিকভাবেই। বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা মাঝে মাঝে আস্ফালনও করছেন তাঁদের স্ব-স্ব শক্তির উল্লেখ করে। এমন সময় দূরে নভমণ্ডলে এক বিরাট বিস্ময়কররূপে আবির্ভূতা হলেন মহাশক্তি। দেবতারা বুঝতে পারলেন না সেই মহাশক্তির স্বরূপ। তখন দেবরাজ ইন্দ্র অগ্নিকে বললেন— হে জাতবেদ, তুমি ওই যে যক্ষটি দেখা যাচ্ছে তার কাছে যাও এবং তাঁর স্বরূপ অবগত হওয়ার চেষ্টা কর। অগ্নি তথাস্তু বলে এগিয়ে গেলেন। তখন সেই মহাশক্তি অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? অগ্নি বললেন, আমি অগ্নি, জাতবেদ নামে খ্যাত। আবার প্রশ্ন হল, তোমার কী সামর্থ্য আছে? অগ্নি বললেন, আমি জগতের সব কিছুকে সহজেই ভস্মীভূত করতে পারি। সেই অজ্ঞাতা মহাশক্তি তখন একটি তৃণ অগ্নির সম্মুখে রেখে বললেন, এটিকে দহন কর। অগ্নি সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেই তৃণটিকে সামান্যভাবেও দহন করতে সমর্থ হলেন না। ফিরে আসলেন মাথা নীচু করে। তখন ইন্দ্র বললেন, হে বায়ু, তুমি গমন কর এবং ঐ যক্ষের স্বরূপ জেনে এসো। বায়ু উপস্থিত হলে সেই মহাশক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? বায়ু বললেন, আমি বায়ু, মাতরিশ্বা নামে খ্যাত। তোমার কী সামর্থ্য? বায়ু বললেন, আমি সব কিছুকে গ্রহণ করতে পারি। তখন যক্ষরূপিণী মহাশক্তি বললেন, ওই তৃণখণ্ডটি গ্রহণ কর। বায়ু প্রবল বেগে প্রবাহিত হলেন, কিন্তু তৃণখণ্ডটিকে বিন্দুমাত্র স্থানচ্যুত করতে পারলেন না। বায়ু তাঁর স্বরূপ বুঝতে না পেরে ফিরে আসলেন।

দেবগণ বললেন, হে ইন্দ্র আপনি গমন করুন এবং ওই যক্ষের স্বরূপ অবগত হওয়ার চেষ্টা করুন। ইন্দ্র তাঁর সমীপে উপস্থিত হওয়ামাত্র সেই বিস্ময়কর রূপটি অন্তর্হিত হলেন, আবার পরমমূহুর্তেই অন্তরিক্ষে বহুবিধ শোভাসম্পন্না, হেমাভরণে ভূষিতা, দেবী উমা হৈমবতী আবির্ভূতা হয়ে ইন্দ্রকে দর্শন দিলেন এবং ইন্দ্রের স্তবপূজায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করলেন। বুঝিয়ে দিলেন যে, সেই মহাশক্তি উমার শক্তিতেই দেবতারা শক্তিমান। তাই অসুর বিজয় মহাশক্তির শক্তিতেই সম্ভব হয়েছে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু কার্য আমরা প্রত্যক্ষ করি সব কিছুর মধ্যেই রয়েছে এক বিরাট শক্তির খেলা। সূর্যের তাপ প্রদান, বায়ুর প্রবহমানতা, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা সব কিছুর মধ্যেই অনুভব করা যায় সেই এক অদ্বিতীয়া ঐশী শক্তির লীলা।

জড় বিজ্ঞান ওই শক্তিকে 'এনার্জি' বলেছে। মলিকিউল, অ্যাটম, ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করে তার ব্যাখ্যা দিয়েছে। অথবা স্ট্যাটিক, প্রোটেনসিয়াল, কাইনেটিক, সাউন্ড, লাইট প্রভৃতি এনার্জি নামে অভিহিত করেছে। বৈজ্ঞানিক থিওরিতে বলা হয়েছে Energy cannot be destroyed but changes its form only অর্থাৎ Energy বা শক্তি কোনোদিন ধ্বংস হয় না। কেবল তার রূপ বা স্বভাব পরিবর্তন করে মাত্র।

ভারতের সনাতন হিন্দু শাস্ত্রও বলেন, ব্রহ্ম বা মহাশক্তি শাশ্বত, সনাতন, অব্যয় এবং সর্বব্যাপী সত্তারূপে বিরজমানা। আবার তিনি এক এবং অদ্বিতীয়া, যদিও প্রয়োজনানুসারে তাঁকে বিভিন্ন নাম, রূপ ও কার্যের মাধ্যমে সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীশ্রী চণ্ডীতে আছে, ভ্রাতা নিশুম্ভ নিহত হওয়ার পর দৈত্যরাজ শুম্ভ এসেছেন মা দুর্গার সঙ্গে যুদ্ধ করতে, কিন্তু দেখলেন মা দুর্গা একা নন। বারাহী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, মাহেশ্বরী, ব্রহ্মাণী, কালী, শিবদূতী প্রভৃতি শক্তিগণ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণা। তখন শুম্ভ বললেন, 'মা দুর্গে গর্বমাবহ'— দুর্গা, তুমি আর গর্ব করো না। কেননা 'অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাহতিমানিনী'— অতিগর্বিতা হয়েও তুমি অন্যান্য দেবীর শক্তির (বল) সাহায্য নিয়েই যুদ্ধ করছ। মা দুর্গা বললেন,

রে দুষ্ট, ব্রহ্মাণী প্রমুখ এই সব দেবী আমারই অভিন্না শক্তি, এই দেখ্, তাঁরা আমারই শরীরে বিলীন হয়ে যাচ্ছেন। তখন বারাহী প্রভৃতি সকল শক্তি মা দুর্গাতে বিলীন হয়ে গেলেন। আর সেই সঙ্গে দেবী একটি অপূর্ব বাণী উচ্চারণ করলেন, 'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা' (শ্রীশ্রীচণ্ডী)। একা মাত্র আমিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিরাজিতা, আমি ছাড়া দ্বিতীয়া আর কে আছে? মায়ের এই বাণী যেন 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়— এই শ্রুতিবাক্যেরই প্রতিধ্বনি।

জড়বিজ্ঞানের বক্তব্যের সঙ্গে হিন্দুধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থের উপলব্ধিপ্রসূত বাণীর কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু বিজ্ঞান সেই এক, অদ্বিতীয় এবং সর্বব্যাপিনী শক্তিকে পূর্ণরূপে এখনও উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি। পক্ষান্তরে, ভারতের ক্রান্তদর্শী ঋষিগণ তপস্যার দ্বারা সেই মহাশক্তিকে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়কারিণীরূপে, জীবজগতের মাতৃস্নেহ দ্বারা পালয়িতারূপে, একান্ত আপনজন সন্তানবৎসলা জননীরূপে দর্শন করতে সমর্থ হয়েছেন। 'বিষ্ণুভক্তি প্রদা দুর্গা সুখদা মোক্ষদা সদা'— মা দুর্গা বিষ্ণুভক্তি প্রদান করেন, জাগতিক সুখসম্পদ দান করেন, আবার ভক্ত চাইলে মা মোক্ষও প্রদান করেন।

শ্রীশ্রী চণ্ডীতে আছে, রাজা সুরথ রাজ্যহারা হয়ে এবং সমাধি বৈশ্য সমাধি সংসার থেকে বিতাড়িত হয়ে অরণ্য মধ্যে বিচরণ করতে করতে মেধস ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হয়েছেন। ঋষির চরণে উপনীত হয়ে নানা প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে তাঁরা অবগত হলেন যে জগজ্জননী মহামায়াই সংসার মুক্তির হেতুভূতা পরমা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী ও সনাতনী। তিনিই সংসার বন্ধনের কারণস্বরূপা অবিদ্যা এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী। মেধস ঋষির উপদেশে আরও জানলেন যে, 'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে' তিনি প্রসন্না হলে মানুষকে মুক্তিলাভের জন্য অভীষ্ট বর প্রদান করেন। ঋষির প্রেরণায় সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য দেবী দুর্গার আরাধনায় ব্রতী হলেন। তাঁরা নদীতটে গমন করে 'দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীম্' দেবী দুর্গার মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণ করে পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি দ্বারা দেবীর পূজা করলেন। সুরথ ও সমাধির কঠোর তপস্যায়, পূজা আরাধনায় সন্তুষ্টা হলেন জগদম্বা চণ্ডিকা এবং প্রত্যক্ষভাবে আবির্ভূতা হয়ে বর প্রার্থনা করতে বললেন। রাজা সুরথ জন্মান্তরে সাবর্ণিমনুরূপে চিরস্থায়ী রাজ্য এবং এই জন্মে শত্রুবিনাশ পূর্বক অপহৃত রাজ্যের উদ্ধার প্রার্থনা করলেন, আর বুদ্ধিমান ও বৈরাগ্যবান বৈশ্য সমাধি প্রার্থনা করলেন সংসারাসক্তি নাশক তত্ত্বজ্ঞান। দেবী উভয়কেই 'তথাস্তু' বলে অন্তর্হিতা হলেন।

দেবী ভাগবতে মর্যাদাপুরুষোত্তম রাষ্ট্রপুরুষ ভগবান রামচন্দ্রের দুর্গাপুজোর কাহিনি পাওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গাপূজার অনুসরণ করেই বর্তমান বাংলার শরৎকালের দুর্গাপূজা হয়ে থাকে। রামচন্দ্র রাবণকে বধের পূর্বে শরৎকালে ১০৮টি নীল পদ্ম দ্বারা দেবীদুর্গার আরাধনা করেছিলেন। ব্রহ্মা ওই পূজায় রামচন্দ্রের সহায়ক ছিলেন। শরৎকালে দেবতারা শয়ন করে থাকেন, তাই অকাল বোধন বলা হয়েছে। দেবীকে জাগরিত করে তাঁর পূজা করা হয়েছিল— তাঁকে বোধন বলা হয়। আজও দুর্গাপূজায় দেবীর বোধন করে তবে তাঁর পূজা হয়। মন্ত্রের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গাপূজার উল্লেখ পাওয়া যায়— রাবণস্য বধার্থায় রামস্য অনুগ্রহায় চ। অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা।। ... দেবী দুর্গা রামচন্দ্রের পূজায় সন্তুষ্টা হয়ে আবির্ভূতা হয়েছিলেন এবং রাবণ বধের জন্য বর প্রদান করেছিলেন।

মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্‌মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দুর্গার আরাধনা করতে বলেন। অর্জুন একাগ্রচিত্তে ভক্তিভাবে দেবীর স্তব করেন। দেবী দুর্গা আবির্ভূতা হয়ে যুদ্ধে জয়লাভের জন্য বর প্রদান করেন।

যেমন 'কেন' উপনিষদে উমা হৈমবতীর কথা বলা হয়েছে তেমনই অন্যান্য কিছু উপনিষদেও শক্তি আরাধনার উল্লেখ পাওয়া যায়। দেখা যাচ্ছে, বৈদিক যুগ থেকে রামায়ণ মহাভারতের যুগের মধ্যে দিয়ে শক্তিপূজার ধারা ভারতে বর্তমান যুগে নেমে এসেছে। আজও সেই ধারা অক্ষুণ্ণভাবে প্রবাহিত।

ভারতের স্বাধীনতার প্রাক্কালে ঋষি অরবিন্দ ভারতমাতাকেই দুর্গারূপে আরাধনা করার শিক্ষা দিলেন। অরবিন্দ দুর্গারূপে ভারতমাতার পূজা করলেন, আর ঋষি বঙ্কিম মন্ত্র দিলেন— 'বন্দে মাতরম্', গাইলেন — ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী... নমামি ত্বাম্। স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, 'আগামী ৫০ বছর ভারতমাতাই তোমাদের আরাধ্য দেবতা হোক।' ভারতবর্ষ মন্দিরময় তীর্থময় দেশ। বারবার স্বয়ং ভগবান, ভগবতী আবির্ভূত হয়েছেন এই দেবভূমি ভারতবর্ষে সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতির রক্ষার জন্য। আজ আমরা অনেকেই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ধর্মকে উপেক্ষা করছি। তার ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আজ দেখা যাচ্ছে দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার ও অপসংস্কৃতির প্রচার প্রসার। দেবী দুর্গা তথা ভারতমাতার আরাধনার মাধ্যমে সুরক্ষিত হোক ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও পরম্পরা, এই একান্ত প্রার্থনা।

JINDAL MECTEC

JINDAL MECTEC PVT. LTD.

Corporate office

Old Manesar Road, Narsingpur, Near Hero Honda Chowk
Behind Bestech Cyber Park Building, Gurgaon - 122001
Haryana, (INDIA).
Tel. +91-124-4086401/ 4393200, Telefax : +91-124 4030807
e-mail : jindalmectec@jindalbrothers.in

Regd. Office

B29 Sanjay Market, Pocket III, Sec. 2, Rohini,
Delhi- 110 085.
Tel. +91.11.27512283, Telefax : +91.11.27514043

Manesar

Plot No. 91, Sec. 8, IMT Manesar,
Gurgaon - 122050
Haryana (INDIA).

Nalagarh

Village Souri, Nalagarh Swarghat Road, Tehsil Nalagarh,
Dist. Solan - 174101 (H.P.)
Tel. +91-1795-220819/ 820, Fax - + 91-1795-220818
www.jindalmectec.com

‘দানবোত্থা ভবিষ্যতি’

প্রবাল চক্রবর্তী

মাথার উপর প্রখর সূর্য গনগনে আগুন বর্ষায় সারাদিন। তার নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচারে ও ঊষর মরুপ্রান্তরে শ্যামলিমার দর্শন দুর্লভ।

ইরানের রাজধানী তেহরান থেকে প্রায় সাতশো কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম ইরাক সীমান্তের কাছে দেখা মেলে প্রাচীন এক মরুশহরের। আধুনিক নাম ‘সুশ’, আদি নাম ‘সুশা’ বা ‘সুশান’। কেউ জানে না, কত প্রাচীন সে শহর। সুশানের পত্তনের ইতিহাস কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। তুষারমৌলী হিমালয়ের সাগর থেকে সাগরব্যাপী উত্তুঙ্গ তরঙ্গায়িত দুই বাহুর দক্ষিণবাহু এই পর্যন্ত এসে নিমজ্জিত হয়েছে মরুপ্রান্তরে। সেখানেই জাগ্রস্ পর্বতের চূড়ায় সীমান্ত শহর সুশান কালাতীত কাল

থেকে আর্যাবর্তের প্রহরী। বহু সহস্রাব্দের বহু সংগ্রামের ইতিহাস। বহু অশ্রু-স্বেদ-রক্তের গাথা মিশে আছে ওই শহরের মাটিতে। এ আখ্যায়িকার পটভূমি সেই প্রাচীন নগরী।

আজ থেকে প্রায় এগারো হাজার বছর পূর্বের কথা...

যেদিকে দু'চোখ যায় শুধু বালি আর বালি। অনন্ত সে বালুকারাশিতে পা বারবার ডুবে যায়, হাঁটা কঠিন। সেই প্রতিকূলতার উজান ঠেলে এগিয়ে চলেছে ক্লান্ত এক পথিক। পরনে তার মলিন ঢিলেঢালা পোশাক। কাঁধে ঝোলা। কোমরবন্ধে অবলম্বিত কোষবন্দি তরবারি।

একটার পর একটা বালিয়াড়ি। প্রতিটা একই রকম দেখতে। একটা পার হলে আরেকটা বালিয়াড়ি সামনে ভেসে ওঠে। তখন মনে হয়, পেছনের রাস্তাটা সত্যিই হেঁটেছি তো? নাকি সেটা শুধুই কল্পনা? আর কত দূর? হে অসু, শক্তি দাও। পথের কষ্ট দূর করে দাও।

হঠাৎ করেই নীল আকাশে ধরল ঘোলাটে রং। বইতে শুরু করল গরম বাতাস। সাথে উড়ে আসছে রাশি রাশি বালি। সে বালি ঢুকে পড়ছে ঢিলেঢালা পোশাকটার মধ্যে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে নাকে বালি ঢুকে পড়ছে। কাঁধের উত্তরীয়টাকে মুখের ওপর জড়িয়ে নিল পথিক। একটা বালিয়াড়ি থেকে নেমে শুরু হল আরেকটা বালিয়াড়িতে চড়া। ঝড়ের প্রাচীর ঠেলে আরও খানিকক্ষণ পথ চলার পর সেই বালিয়াড়ির মাথায় পৌঁছলো পথিক। তখনই চোখে পড়ল, দূরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে রক্তবর্ণ এক প্রকাণ্ড পর্বতশ্রেণী। দুই পর্বতের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ম তার অন্ধকার বিবর ব্যাদন করে প্রতীক্ষা করছে পথিকের। গিরিবর্ত্মের দু'ধারে বিশাল দুই লালচে-হলুদ পাথরের স্তম্ভ খাড়াই দণ্ডায়মান, দুই দ্বাররক্ষীর মতো। কোমরবন্ধটাকে কষে বেঁধে উৎসাহে জোর কদমে পা চালালো পথিক।

থামগুলো আন্দাজ ত্রিশ হাত উঁচু। গায়ে তার খোদাই করা নানান চিহ্ন ও মূর্তি। সেগুলো দেখে ঘৃণায় মুখ বিকৃত করল পথিক। দুই থামের মাঝখানে সাদা তাঁবু। তার মাথায় অগ্নিচিহ্ন-লাঞ্ছিত স্বর্ণাভ-সিন্দুর বর্ণের পতাকা মরুবাতাসে পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে, আগুন জ্বলছে তাঁবুর মাথায়। তাঁবুর বাইরে একটা উঁচু চৌকি। তার ওপর ডাঁই করে রাখা আছে রকমারি আকৃতির ভূর্জপত্র। বালির ঝড়ে যাতে সেসব উড়ে না যায়, তার জন্য ভূর্জপত্রের স্তূপের ওপরে চতুষ্কোণ কয়েকটা পাথর চাপা দেওয়া আছে। সেগুলোও লালচে-হলুদ রঙের, ওপরে খোদাই কারুকাজ। পথিককে আসতে দেখে কয়েকজন প্রহরী তাঁবুর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।— 'খবরদার'। চেঁচিয়ে বলল তাদেরই একজন। পথিক হাত তুলে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল তাদের দিকে।

'নাম কি?'— প্রশ্ন করল প্রহরী।

'রক্তবীজ'— বলল পথিক।

'নগরে কী উদ্দেশ্যে আগমন?'— প্রশ্ন প্রহরীর।

'বাণিজ্য'— বলল রক্তবীজ।

'বাণিজ্য?' অবাক হল প্রহরী, 'পণ্যসম্ভার কই তোমার?'

'পণ্য সব বক্ষুনদীর ওপারে আমার স্কন্ধাবারে রেখে এসেছি'— বলল রক্তবীজ।

'বক্ষুনদী? সে তো বেশ কয়েকদিনের রাস্তা!'— অবাক হল প্রহরী। 'পণ্য ছাড়া কিভাবে বাণিজ্য করবে শহরে?'

'আমি এখন এ শহরের চাহিদা বুঝতে এসেছি'। — বলল রক্তবীজ। 'শহর ঘুরে দেখে বুঝে শুনে তারপর আমার পণ্যবাহী গর্দভগুলোকে নিয়ে আসবো। যেসব পণ্য এ শহরের প্রয়োজন, বেছে বেছে সেসবই আনবো। এতদূর থেকে পণ্য নিয়ে আসার খরচ অনেক। সব পণ্য নিয়ে যদি হাজির হই, আর সেসব যদি বিক্রি না হয়, বড় ক্ষতি হয়ে যাবে।'

'সে তো ঠিক কথা'— মাথা নেড়ে বলল প্রহরী। 'এক স্বর্ণমুদ্রা শুল্ক লাগবে, শহরের প্রবেশমূল্য। এছাড়া তোমার অস্ত্রশস্ত্র সব এখানে রেখে যেতে হবে। শহরের মধ্যে অস্ত্র নিয়ে ঢোকার অনুমতি নেই।'

'ঠিক আছে'— রক্তবীজ ঝোলা থেকে একটি স্বর্ণমুদ্রা বের করে প্রহরীর হাতে দিল। কোমর থেকে তরবারি খুলে সেটাও প্রহরীর হাতে সমর্পণ করল। অন্য প্রহরী পথিককে ভালো করে তল্লাশি করল। আপত্তিকর কিছু পেল না।

'এ শহরে তোমার চেনাজানা লোকজন আছে?'— বলল প্রহরী। 'কোনো বন্ধুবান্ধব?'

'না' — উত্তর দিল পথিক।

'তাহলে থাকবে কোথায়?'

'পান্থশালে'— বলল পথিক।

'উত্তম'। এই বলে এক টুকরো ভূর্জপত্র হাতে তুলে নিল প্রহরী। কলম দিয়ে খসখস্‌ করে কিছু লিখলো তার ওপর। দ্বিতীয় প্রহরী আগুনে গালা গরম করে তারই এককোঁটা

ফেলল ভূর্জপত্রের ওপর। প্রথম প্রহরী তার ওপর নিজের আংটির ছাপ লাগিয়ে ভূর্জপত্রের টুকরোটা পথিকের দিকে এগিয়ে দিল।

'সীমান্ত-শহর সুশানে স্বাগতম'— বলল প্রহরী।

'ধন্যবাদ'— ভূর্জপত্র কাঁধের ঝোলায় রেখে শহরের দিকে পা বাড়ালো রক্তবীজ।

খাড়াই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে সরু গিরিবর্ত্ম, চলে গেছে পাহাড়ের অপরপার পর্যন্ত। সেই গিরিপথের দুধারে অনেক উঁচুতে জায়গায় জায়গায় পাহাড়ের গায়ে ফোকর রয়েছে। তার পেছনে প্রচ্ছন্ন থেকে নগররক্ষীরা গিরিবর্ত্ম পাহারা দিচ্ছে। আড়চোখে সবই দেখে রাখলো রক্তবীজ। প্রায় অর্ধেক প্রহর গিরিবর্ত্ম বেয়ে হাঁটার পর পথ হঠাৎই শেষ হয়ে গেল। রক্তবীজ দেখতে পেল, চারিদিকে পাহাড়ের ঘেরাটোপের মাঝখানে লুক্কায়িত এক উপত্যকা, তারই মাঝে নয়নাভিরাম এক শহর। পুরো শহরটাই পাহাড় কেটে তৈরি হয়েছে। শহরের দেওয়ালে পাথরের গায়ে খোদাই করা নানান চিত্র। ধনুর্ধর যোদ্ধার সারি। পাখি, সিংহ, ঘোড়া। পক্ষীরাজ ঘোড়া, ডানাওয়ালা সিংহের ওপর মানুষের মাথা, এরকম অদ্ভুত সব ছবি। ময়ূরের ছবি রয়েছে বেশ কয়েকটা। ছবিগুলো দেখে আরেকবার ঘৃণায় মুখ বিকৃত করল রক্তবীজ।

বহুতল বাড়ি, উঁচু উঁচু তার থাম, চাতাল, খিলান, জানালা দরজা— সবই পাথর কেটে তৈরি। প্রতিটি বাড়ির ধারে ধারে জলনিকাশী নালা, তাও পাথর কেটে তৈরি। পাহাড়ের মাঝে যতদূর পর্যন্ত চোখ যায়, স্তরে স্তরে পাথর খোদাই বাড়ির সারি। ঘাড় উঁচিয়ে দেখতে দেখতে ঘাড় ব্যাথা হয়ে গেল রক্তবীজের। এক জায়গায় পথের বাঁক ঘুরতে থমকে দাঁড়ালো সে। শহরের মধ্যিখানে বিশাল এক সরোবর। বাঁধানো পাড়, সরোবরকে বেড় দিয়ে রেখেছে প্রশস্ত রাজপথ।

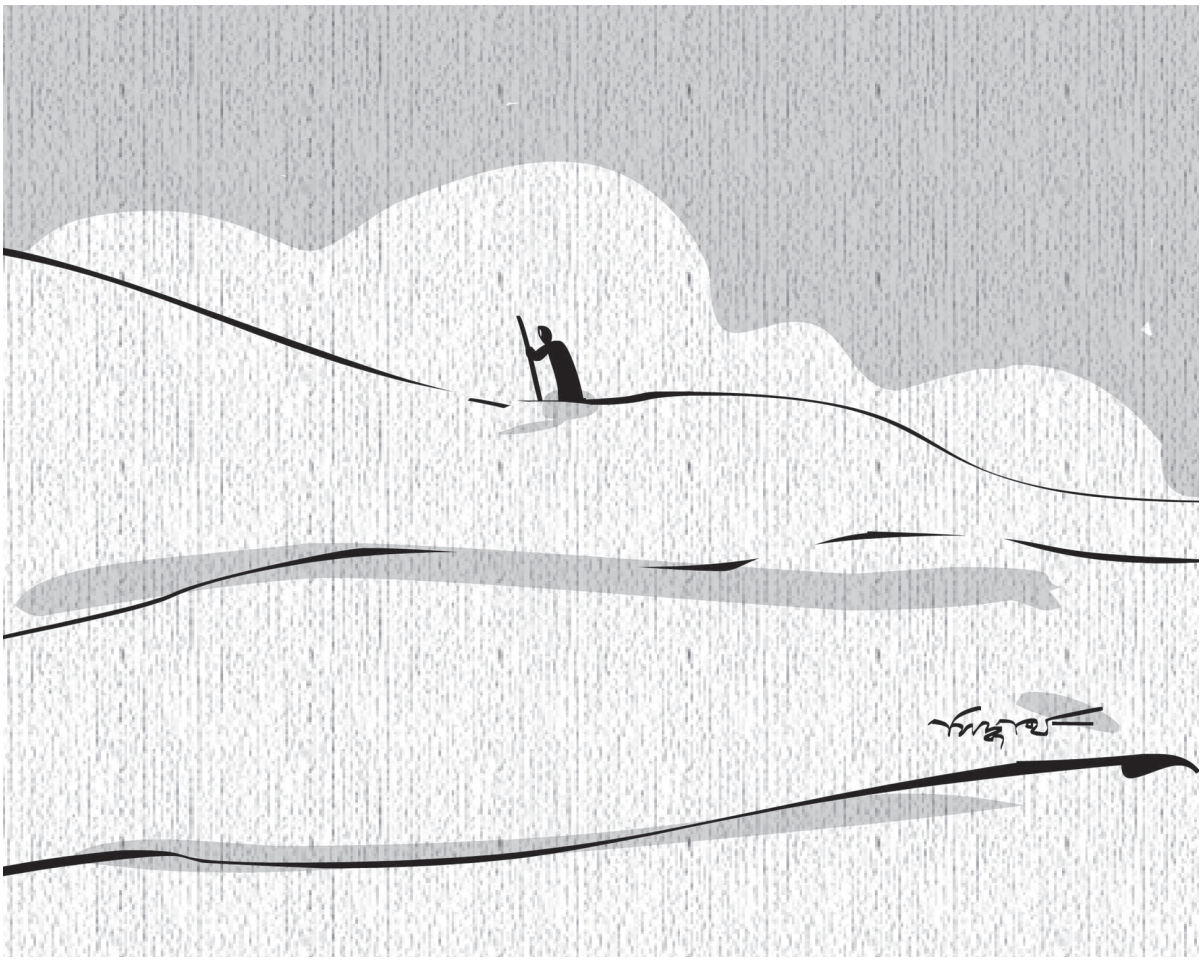

সরোবরের ঠিক মাঝখানে ছোট্ট একটি দ্বীপ। সবুজে ঢাকা সেই দ্বীপে অনেক ময়ূর আর হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। সরোবরের ঠাণ্ডা বাতাস পথশ্রমের ক্লান্তি নিমেষে মুছে দিল। মুগ্ধচোখে খানিকক্ষণ নয়নাভিরাম সে সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে রইল রক্তবীজ।

কী সুন্দর!

না, না মুগ্ধ হলে চলবে না। মুগ্ধ হলে দুর্বল হয়ে পড়ব। কাজ আছে। খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

হাঁটতে হাঁটতে রক্তবীজ এসে পড়ল এক উন্মুক্ত প্রান্তরে। অনেক লোকের সমাগম সেখানে। পথের ধারে বিপণী সাজিয়েছে ব্যবসায়ীরা, রকমারি পসরা বিক্রি হচ্ছে। জম্বুদ্বীপের নানান প্রান্ত থেকে পণ্যসামগ্রী জড়ো হয়েছে হাটে। কপিশার লোমবস্ত্র, ব্রহ্মার গুড় ও স্বর্ণালঙ্কার, প্রাগজ্যোতিষপুরের বেত্র ও রেশম, সিন্ধু ও কৃষ্ণা অববাহিকার খাদ্যশস্য, লোথালের কাপাস, লঙ্কা ও কন্যাতীর্থর মশল্লা— কি নেই সেই হাটে! বিকিকিনির হইচইতে সরগরম সে পণ্যবীথি। স্থানে স্থানে ভল্লধারী নগররক্ষীরা পাহারায় মোতায়েন, চারিদিকে তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। রক্তবীজ সাবধানে মুখ ঢেকে নিল আরেকবার। এদিক-ওদিক ইতিউতি দেখতে দেখতে হাটের মধ্যে গিয়ে এগোলো সে। পদক্ষেপে অগোছালো ভাব, যেন নির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্য নেই, এমনই বাজার দেখে বেড়াচ্ছে। কিন্তু অবগুণ্ঠনের আড়ালে তার জ্বলজ্বলে চোখদুটো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছু একটা খুঁজছে। কেউ খেয়াল করল না সেটা। দু-একবার নাক কুঁচকালো রক্তবীজ। পরিচিত একটা গন্ধ নাকে এসেছে। সেই গন্ধ অনুসরণ করে এলেমেলো হাঁটতে হাঁটতে একটা দোকানের সামনে গিয়ে হঠাৎই দোকানের সামনে পাতা চৌকিতে বসে পড়ল। খাবারের দোকান। মোদক কড়াইতে দুধ জ্বাল দিচ্ছে। থরে থরে মিষ্টান্ন সাজানো রয়েছে। অনেকগুলো মাটির বয়াম ভর্তি করে রাখা আছে ঘি। মোদকের পিছনে দেওয়ালে উঁচুতে টাঙানো এক অদ্ভুতদর্শন শিংওলা মুকুট। বিপণীর অন্তভাগে ভারি কাপড়ের পর্দা ঝুলছে, বিপণীকে দু-ভাগে ভাগ করেছে সেই পর্দা। সরেস ঘিয়ের গন্ধ, ক্ষীরের মিষ্টির গন্ধ, দুধ জ্বালের গন্ধ— সব মিলেমিশে এক অদ্ভুত গন্ধ সৃষ্টি হয়েছে। পথচলতি লোকজন যারা দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছে, নাকে হাত দিচ্ছে। রক্তবীজ নির্বিকার। দেখে বোঝা যায় ও গন্ধে তার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

'কী সৌভাগ্য আমার' মোদক হাত কচলাতে কচলাতে রান্না ছেড়ে এগিয়ে এল। একগাল হেসে বলল, 'কী খাবেন বলুন? তক্তি দিই? সরেস ক্ষীরের তৈরি তক্তি। এইমাত্র বানালাম। সারা সুশাসন শহর খুঁজে ফেললেও আমার দোকানের মতো তক্তি কোথাও পাবেন না।'

রক্তবীজ ভালো করে তাকিয়ে দেখল মোদকের দিকে। খর্বাকৃতি, স্ফীতোদর। গাত্রবর্ণ ও মুখের আদল এই অঞ্চলের লোকেদের তুলনায় একটু ভিন্ন। চোখে চপল ধূর্ততা।

''তুমি কী 'সুশাসন' বললে?' — প্রশ্ন করল রক্তবীজ। 'এদেশীয়দের মতো 'সুশান' বলো না তুমি এই শহরটাকে?'

'এরা সব প্রান্তিক জনজাতি' — ঠোঁট উল্টে বলল মোদক। 'উচ্চারণের দোষ আছে এদের বিস্তর। তাই বলে আমিও কী ভুল উচ্চারণ করব?'

'তুমি এখানকার লোক নও?'— প্রশ্ন করল রক্তবীজ।

'আমি? না না!' — সগর্বে মাথা নেড়ে বলল মোদক— 'আমার আদি নিবাস জম্বুদ্বীপের মধ্যভাগে। আমার মহিষগুলোও সব সেখানেরই। এ হল খাঁটি মোষের দুধ, এমনটি এ অঞ্চলে আর কোথাও পাবেন না। এই নগরের অন্য মোদকরা সবাই উটের দুধ ব্যবহার করে। আমি তা করি না। তা, এবার বলুন কি খাবেন? তক্তি এনে দিই ক'টা?'

ধীরে সন্তর্পণে কাঁধের ঝোলা থেকে রক্তবীজ বের করে আনলো মোষের করোটির একটা শিরস্ত্রাণ। ঠিক যেমনটা মোদকের দেওয়ালে টাঙানো আছে। নিমেষে মোদকের মুখের হাসি শুকিয়ে গেল।

'ভেতরে আসুন'— মোদক বলল রক্তবীজকে। বলেই ক্ষিপ্রপদে দোকানের অন্তভাগের দিকে এগোলো। পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। পিছু পিছু ঢুকে পড়ল রক্তবীজ। দুধের কড়াইতে তখন পোড়া লেগেছে। দুধপোড়া কটু গন্ধ বাতাসে। সেসব কিছুই খেয়াল করল না মোদক।

কয়েকদিন পরের কথা।

সূর্য ওঠার আগেই বেরিয়ে পড়েছিল দু-জনে— রক্তবীজ ও মোদক। বেরোনোর আগে মনে করে মোদক তার পোষা পায়রাটিকে উড়িয়ে দিয়েছিল শেষরাতের ঘন

কালো আকাশে।

যুধানগরীর প্রান্তে, রক্তিম পর্বতশ্রেণীর শেষ লহরী যেখানে পশ্চিমের মরুপ্রান্তরে বিলীন হয়েছে, আর্যাবর্তের সেই সীমান্তে পর্বতশ্রেণীর চূড়ায় রয়েছে অগ্নিমন্দির। স্থানীয়রা বলে 'অতীশগৃহ'। দূরদূরান্ত থেকে অগ্নি উপাসকরা আসে সহস্রাধিক বছরের প্রাচীন এই মন্দিরে পূজা দিতে। জম্বুদ্বীপের অগ্নি উপাসকদের বিশ্বাস, 'অগ্নিদেবতা' অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা শক্তি স্বয়ং অধিষ্ঠান করেন প্রাচীন এই অতীশগৃহে।

ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে গেছে পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত। প্রায় দু'হাজার সিঁড়ি। শেষ ধাপে পৌঁছে পেট চেপে ধরে সিঁড়ির ওপরেই বসে পড়ল মোদক, ভীষণ জোরে হাঁপাতে লাগলো। রক্তবীজের শরীরে ক্লান্তির কোনো লক্ষণ নেই। মোদকের জন্য অপেক্ষা না করেই দৃঢ় পদক্ষেপে সে এগিয়ে গেল মন্দিরের দিকে। মোদক দেখল, ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে রক্তবীজের কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গবস্ত্র পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। যেন অসুর বিজয়কেতন। বুকের মধ্যে দুরুদুরু দুন্দুভি বেজে উঠল মোদকের। হে অসু, শক্তি দাও। আমার মনের ভয় দূর করো।

টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়ালো মোদক। পেট চেপে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে এগোলো মন্দিরের দিকে।

পদ্মকোরকের আকৃতির মন্দির, চারপাশে সুউচ্চ প্রাচীর। সে প্রাচীরের আড়াল থেকে কোরকের মাথাটাই শুধু দেখা যাচ্ছে। প্রাচীরের চার কোণায় চার অগ্নিকুণ্ড, কাঠের সমিধে জ্বলছে। দীর্ঘ আয়তক্ষেত্রাকার দরজার ওপারে মন্দিরের মেঝে মসৃণ পাথরের তৈরি। পাথরের দেওয়াল জুড়ে জম্বুদ্বীপের অগ্নি-উপাসনার ইতিহাস চিত্রাকারে বর্ণিত। প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার ছবি আঁকা রয়েছে সেখানে। ভারতবর্ষে অগ্নি উপাসনার আদি থেকে সেই উপাসনা পদ্ধতির বিবর্তনের প্রতিটি ধাপ, যুগ যুগ ধরে ব্যবহৃত প্রতিটি মন্ত্র খোদাই করা আছে দেওয়াল জুড়ে। ঘরের ঠিক মধ্যিখানে গর্তের মধ্যে আগুন জ্বলছে। কোনো জ্বালানী নেই, তবু এ

আগুন এখানে আবহমানকাল ধরে জ্বলছে। শত ঝড়বাদলেও নেভে না। অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসে আছেন বৃদ্ধ এক পুরোহিত, উদাত্ত কণ্ঠে নিরবচ্ছিন্ন স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছেন। সাদা লম্বা দাড়ি তাঁর। সাদা গোঁফ, লম্বা সাদা চুল, পরনে সাদা কাপড়। পুরোহিতের পশ্চাতে সারি দিয়ে বসে আছে পুরোহিতের শিষ্যরা। প্রায় জনা চল্লিশেক শিষ্য, তাদেরও সবার পরনে শ্বেতবস্ত্র। সমবেত কণ্ঠের মন্ত্রোচ্চারণের স্বরে গমগম করছে মন্দির।

অগ্নিকুণ্ডের ঠিক সামনে, পুরোহিতের বিপরীত প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালো রক্তবীজ। ভঙ্গিতে তার বেপরোয়া ঔদ্ধত্য। বৃদ্ধ পুরোহিত কিছু বোঝার আগেই নিজের নিম্নাঙ্গের আবরণ আলগা করে অগ্নিকুণ্ডে প্রস্রাব করে দিল রক্তবীজ। পুরোহিতের হৃদয়বিদারী আর্তনাদে কেঁপে উঠল মন্দির। জবাবে রক্তবীজ কঠোর পদাঘাতে বৃদ্ধ ঋত্বিককে ভুলুণ্ঠিত করল। কোমর থেকে তলোয়ার খুলে হুঙ্কার দিল—

'মূর্খ পৌত্তলিক! উপাস্য অগ্নি নয়, উপাস্য অসু। তিনিই সকল প্রাকৃতিক শক্তির নিয়ন্তা, তিনিই জগতের প্রভু। এই দ্যাখ, তোদের অগ্নিদেবকে কেমন করে আমি অশুচি করে দিলাম। কিছু করতে পারল কি তোদের এই অগ্নিদেব?'

রক্তবীজের তরবারির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগলো মন্দিরগাত্র, যাবতীয় শিল্পকর্ম আর নান্দনিকতা। বিলুপ্ত হতে লাগলো সহস্র বছরের ইতিহাস। যে ইতিহাস অসু-র ইতিহাস নয়, সে ইতিহাসের কি মূল্য? যাক সব ধ্বংস হয়ে। নিরস্ত্র পুরোহিত-শিষ্যরা প্রাণপণে বাধা দিল, তারা কচুকাটা হল রক্তবীজের তরবারির প্রহারে। কয়েকজোড়া পায়ের শব্দ শুনে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল মোদক, পাহারাদার সৈন্যরা ধেয়ে আসছে মন্দিরের দিকে। মনে মনে অসুকে শেষবারের মতো স্মরণ করে কোমর থেকে তলোয়ার খুলে রুখে দাঁড়ালো সে।

'অন্ধ নির্বোধ প্রকৃতি উপাসক পৌত্তলিক। নরকে যাবি তোরা।' — চেঁচিঁয়ে বলল মোদক। বলতে বলতেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

এক প্রহর পরের কথা। সূর্য দিগন্তরেখা ছাড়িয়ে অনেকটা ওপারে উঠে পড়েছে। সোনার রং ধরেছে তার গায়ে। ইতিমধ্যে শহরে খবর রটে গেছে, অসুররা অপবিত্র করে দিয়েছে হাজার বছরের প্রাচীন অগ্নিমন্দির। সুশাসনের নাগরিকদের ভিড় ভেঙে পড়ছে অতীশগৃহের চারপাশে। মন্দিরের মধ্যে ঢোকার সাহস পাচ্ছে না কেউ। যে কেউই পা বাড়াচ্ছে ভেতরে, মন্দিরের লাঞ্ছিত দেওয়ালগুলো দেখে শিউরে উঠে ছিটকে বেরিয়ে আসছে। অপবিত্র ভগ্ন অতীশগৃহের মেঝেতে পড়ে আছে মোদক আর রক্তবীজের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ। পড়ে আছে ঋত্বিকদের লাশ। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মন্দিরের মেঝে। তারই মধ্যে বসে হাউহাউ করে কাঁদছেন বৃদ্ধ পুরোহিত। রক্তে ভেজা মুখ, গোঁফদাড়ি। রক্তে ভেজা শুভ্র বসন। জনাদশেক সৈনিক বসে আছে মন্দিরের চাতালে। রক্তে মাখামাখি তাদের তরোয়ালগুলো তারা পাশেই ফেলে রেখেছে আলগোছে। সৈনিকদের দৃষ্টিতে রয়েছে শুধুই শূন্যতা। যেন জীবনের ওপর থেকেই বিশ্বাস হারিয়ে গেছে তাদের।

এক পক্ষকাল পরের কথা।

রক্তিম পর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে অগ্নি-প্রমুখ। তিনি জম্বুদ্বীপের অগ্নি উপাসকদের নেতা, সীমান্ত শহর সুশাসনের মহানাগরিক। তাঁর দৃষ্টি পূর্বদিগন্তে নিবদ্ধ। কালচে মেঘে ঢেকে গেছে পূবের দিগ্‌বলয়। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে অনেক মরুঝড় দেখেছেন অগ্নি-প্রমুখ। কিন্তু এ ঝড়ের সঙ্গে তাদের কারোর মিল নেই। ভয়ঙ্কর এক অমঙ্গলের বার্তা বয়ে আনছে ঐ ঝড়। আর্যাবর্তের সর্বনাশের বার্তা, তার সর্বংসহা অপৌরুষেয় সংস্কৃতির বিনাশের সংবাদ বয়ে আনছে ওই আঁধি।

দেখতে দেখতে এগিয়ে এল পুঞ্জীভূত ধূলিকণা কুণ্ডলী। অগ্নি-প্রমুখ দেখলেন, ধূলিঝড়ে সওয়ার হয়ে অগণিত মহিষ-আরোহী এগিয়ে আসছে রক্তিম পর্বতশ্রেণীর দিকে। প্রতিটি মহিষের পিঠ তাম্রনির্মিত বর্মে ঢাকা। বর্ম আরোহীদের শরীরেও। মহিষ-করোটি নির্মিত শিরস্ত্রাণ তাদের প্রত্যেকের মাথায়। গিরিপর্বতের মুখে, পাথরের দুই স্তম্ভের মাঝখানে, যেখানে আগে সীমান্তশুল্ক দপ্তর ছিল ঠিক সেইখানে এসে মহিষ-বাহিনী থমকে দাঁড়ালো। দেখা গেল, মহিষ-বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছে বর্মচর্মশোভিত দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ এক যোদ্ধা। অতিকায় এক মহিষের পিঠে আরোহী সে। একহাতে তার খড়্গ, অন্য হাতে ঢাল।

'আমি একদিন তোমার বাবাকে অগ্নিপ্রবেশ থেকে রক্ষা

করেছিলাম'— মনে মনে বললেন অগ্নি-প্রমুখ— 'তার প্রতিদান দিতেই কি আজ এসেছো?'

চিন্তার তরঙ্গে কথাগুলো ভেসে এসে আঘাত হানলো দীর্ঘদেহী যোদ্ধার চেতনায়। চমকে ওপরদিকে তাকালো সে। এক লহমার জন্য খড়্গের ওপর তার দৃঢ়মুষ্টি শিথিল হল। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিল সে।

'আমাকে ক্ষমা করবেন'— মনে মনে বলল দীর্ঘদেহী, — 'আমি অকৃতজ্ঞ নই। কিন্তু আমার শ্রেষ্ঠত্বের পথ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে আপনার অগ্নিসমাজ।'

'অসুর সেনা'— পেছন ফিরে হুঙ্কার দিয়ে বলল দীর্ঘদেহী যোদ্ধা। 'চেয়ে দ্যাখো, তোমাদের সামনে পাপভূমি সুশাসন, যার অসভ্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন নাগরিকরা আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় রক্তবীজকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এরা জানে না, এক রক্তবীজ মরলে হাজার রক্তবীজ জন্মায়। কেন হত্যা করেছিল ওরা রক্তবীজকে? কি ছিল তার অপরাধ? অগ্নির উপাসনা করতে সে সম্মত হয়নি, এই ছিল তার অপরাধ, তাই না? মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও সে বলে গেছে অসু বিনে উপাস্য কেউ নেই, কেউ হতে পারে না। সেই শাশ্বত সত্য দৃঢ়ভাবে বলার অপরাধে এই সুশাসননগরী তাকে প্রাণদণ্ড দিয়েছে। বন্ধুরা, আজ এই নোংরা পৌত্তলিকগুলোকে উচিত শাস্তি দিতে হবে। দেখিয়ে দিতে হবে, বিপদে অগ্নিদেব তাদের সহায় হবে না। কারণ অগ্নিদেব কোনো শক্তি নয়, ব্রহ্মাণ্ডের আসল শক্তি শুধু সেই পরমপিতা অসু। সেই পরমারাধ্য অসু আমাদের সহায়। আমাদের আর ভয় কি? অসুর যোদ্ধারা, আক্রমণ!

মরুপ্রান্তরের অগ্নিবৎ সূর্যালোকে ঝলসে উঠল দীর্ঘদেহীর মহিষ-মুকুট। তার বাহন পবনবেগে দৌড়লো গিরিসংকটের দিকে। পেছনে সারবন্দী লক্ষাধিক মহিষে সওয়ার সুবিশাল সুশৃঙ্খল বাহিনী। গিরিবর্ত্মের মুখ রক্ষা করছিল যে সৈন্যরা, খড়কুটোর মতো উড়ে গেল তারা। গিরিসঙ্কট দিয়ে দৌড়ালো মহিষ-বাহিনী। পাহাড়ের অলিন্দে লুকনো সৈন্যরা শুরু করল তীরবৃষ্টি। সেসব তীরের অধিকাংশই মহিষ ও তার আরোহীদের বর্মচর্ম শিরস্ত্রাণে লেগে বিফল হল। মহিষ-বাহিনী অবলীলাক্রমে ঢুকে পড়ল সুশাসনে। রাস্তায় রাস্তায় শুরু হল খণ্ডযুদ্ধ। মহিষ-বাহিনী সংখ্যায় অগণিত। ক্রুদ্ধ সে মহিষ-যূথের বিরুদ্ধে যে কেউই প্রতিরোধে দাঁড়ালো, তার নৃশংস মৃত্যু ঘটল মহিষ-সিংয়ের আঘাতে বা মহিষ-আরোহীর খড়্গে। সহস্র বছরের প্রাচীন শহর সুশাসন, জম্বুদ্বীপের সীমান্তরক্ষী সুশাসনের পতন হল কয়েক দণ্ডের মধ্যেই। দীর্ঘদেহী যোদ্ধাকে ঘিরে ধরে জয়ধ্বনি দিল অসুরসেনা। 'মহিষাসুরের জয়'। নিনাদে কলঙ্কিত হল সুশাসনের পথঘাট হর্ম্য নিকেতন।

পাহাড়ের চূড়ার অগ্নিমন্দির সম্পূর্ণরূপে ধূলিসাৎ হল। অগ্নিকুণ্ডের আগুন কিন্তু তবুও প্রজ্জ্বলিত রইল। সে প্রাকৃতিক আগুন শত চেষ্টাতেও নেভাতে পারলো না মহিষ-সেনারা। সেই রাতে, হাজার হাজার রমণীর ক্রন্দনে মথিত হল মরুপ্রান্তরের বাতাস। সে বাতাসে মিশে গেল নররক্তের কটু গন্ধ। পাহাড়ের চূড়ার আগুন তবু মরুর আকাশকে আলো করে রাখলো সারারাত।

'ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি, তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরি সংক্ষয়ম'— সেই রাতে, জম্বুদ্বীপের যে প্রান্তে এই নারকীয় বিনাশলীলা সংঘটিত হল, তার ঠিক বিপরীত প্রান্তে, পূর্ব হিমালয়ের কোলে মাতৃ-উপাসক উপজাতিদের ছোট্ট একটি গ্রামে দরিদ্র এক জীবান্তক পরিবারের জন্ম হল সর্বসুলক্ষণা তেজস্বিনী এক কন্যার। গ্রামের পাঠশালার গুরুমশাই গণনা করে বললেন, জগতের দুর্গতি নাশ করতেই একন্যা ধরাধামে জন্ম নিয়েছে। তাই গুরুমশাইয়ের পরামর্শে কন্যার বাবা-মা তাঁর নাম রাখলেন— দুর্গা।

MUNJAL SHOWA

Munjal Showa Ltd. is the largest manufacturer of Shock Absorbers, Front Forks, Struts (Gas Charged and Conventional) and Gas Springs for all the leading OEM's in 2 Wheeler/4 Wheeler Industry in the Country. Manufactured Products conform to strict its standard for Quality and Safety. Company's Products enjoy reputation for Smooth, Comfortable, Long-Lasting, Reliable and Safe Ride. The Company is QS 9000, TS – 16949, ISO 14001, OHSAS 18001 and TPM Certified Company. MSL has technical and financial Collaboration with Showa Corporation Japan.

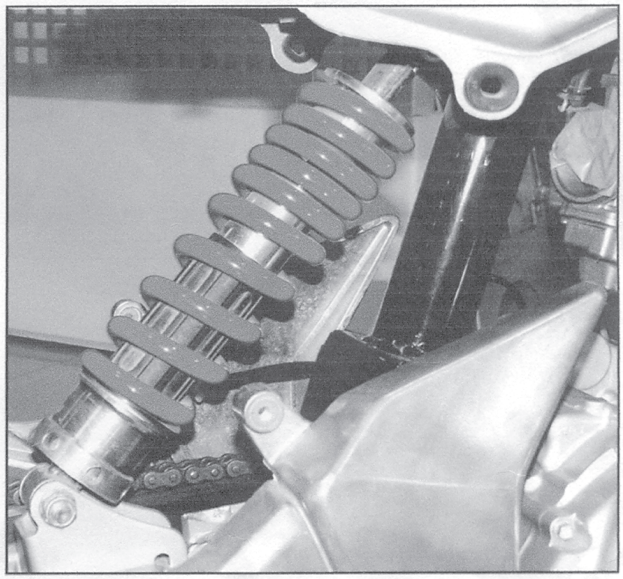

TPM Certified Company

ISO / TS - 16949 – 2002 Certified

ISO - 14001 & OHSAS – 18001 Certified

Our prestigious Client List :

- Hero MotoCorp Ltd.
- Maruti Suzuki India Ltd.
- Honda Cars India Ltd.
- Honda Motorcycle & Scooter India (P) Ltd.
- India Yamaha Motor Pvt. Ltd.

Our Products

- **Struts/Gas Struts**
- **Shock Absorbers**
- **Front Forks; and**
- **Gas Springs**

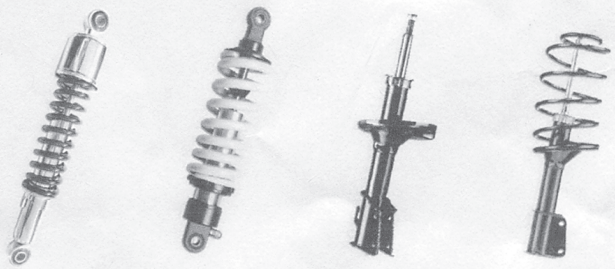

MUNJAL SHOWA LTD.

• Plot No. 9 – 11, Maruti Industrial Area, Gurgaon. Tel. No. : 0124 – 2341001, 4783000, 4783100
• Plot. No. 26 E & F, Sector – 3, Manesar, Gurgaon Tel. No. : 0124 – 4783000, 4783100
• Plot No.1, Industrial Park – II, Village Salempur, Mehdood – Haridwar, Uttarakhand Tel. No. : 0124–4783000, 4783100

শকাব্দ : ভারতের নিজস্ব জাতীয় কালপঞ্জী

রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

ভূমিকা

প্রায় ১৩০ কোটি মানুষের বাসস্থান বিশাল আমাদের এই দেশ ভারতবর্ষে। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এই ১৩০ কোটি মানুষের না আছে ভাষার মিল, না আছে পোশাক-পরিচ্ছদের মিল, না আছে আহার-বিহারের মিল। কবির ভাষায় বলতে হয়— নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান। কিন্তু এত বিভেদ সত্ত্বেও তাদের মধ্যে বিরাজ করছে এক মিলন মহান। খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা চীনের জনসংখ্যাকে অতিক্রম করে যাবে এবং ভারত হবে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জনবহুল দেশ। অনেকের মতে, আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা ১৬০ কোটির বেশি হয়ে যাবে।

যাই হোক, এতসব অমিলের মধ্যে আরও একটা অমিল হলো তাদের দিন, মাস ও বছর গোনার পদ্ধতি। আমরা বাঙালিরা পয়লা বৈশাখের দিন থেকে নতুন বছর গুনি। কিন্তু

একটা রৌপ্য মুদ্রার সোজা দিক এবং উল্টো দিকের ছবি দেখানো হয়েছে। সোজা দিকে রুদ্রসেনা নামে এক শাসকের ছবি রয়েছে এবং উল্টোদিকে ব্রাহ্মী হরফে ১৩১ শতাব্দ (অর্থাৎ ২০৯ খ্রিস্টাব্দ) লেখা হয়েছে।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে আরও কয়েকটা কথা বলে রাখা সঙ্গত হবে। বিগত ১৯৯৮ সালে ভারতের জনসংখ্যা ১০০ কোটি অতিক্রম করে যায় এবং বর্তমানে তা ১৩০ কোটিতে পৌঁছেছে। তাই আজ পৃথিবীর প্রায় ১৭.৫ শতাংশ মানুষ এই ভারতে বসবাস করে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, আগামী ২০২২

সমগ্র উত্তর ভারতের মানুষ চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপদের দিন নববর্ষ পালন করে। কেরলের লোকেরা যে ক্যালেন্ডার বা কালপঞ্জী ব্যবহার করে তার নাম কোল্লম এবং চিঙ্গম মাসের পয়লা তারিখে নববর্ষ পালন করে। তামিলনাড়ুর লোকেরাও ওই দিনই নববর্ষ পালন করে থাকে। পঞ্জাবের লোকেরা যে

শিখ ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে সেই শিখ ক্যালেন্ডারের বৈশাখ মাসের পয়লা তারা বৈশাখী বা নববর্ষ পালন করে। সাধারণত গ্রেগরিয়ান কালপঞ্জীর ১৩ এপ্রিল এই বৈশাখী উৎসব পালিত হয়।

অসমের লোকেরা যে কালপঞ্জী অনুসরণ করে তার নাম ভাস্কর। এই ভাস্কর কালপঞ্জীর প্রথম মাসের নামও বৈশাখ। অসমে বৈশাখ মাসকে বলে বোহাগ এবং বোহাগ মাসের প্রথমদিন তাদের নতুন বছর শুরু হয়। ওইদিন তারা নববর্ষ উৎসব পালন করে, যাকে তারা বোহাগী বলে। সাধারণত গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের ১৩ বা ১৪ এপ্রিল এই বোহাগী পালিত হয়। এই বছর ২০১৬ সালে ১৪ এপ্রিল এই বোহাগী উৎসব পালিত হয়েছে। এই বোহাগী উৎসবকে তারা রঙ্গালী বিহুও বলে। ছয়দিন ধরে এই রঙ্গালী বিহু চলতে থাকে। বছরের বিভিন্ন সময়ে অসমের লোকেরা প্রধানত ৩টি বিহু পালন করে। এগুলো হল রঙ্গালী বিহু, কঙ্গালী বিহু এবং ভোগালী বিহু। কৃষিকাজের সঙ্গে এই বিহু উৎসবগুলি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।

এই সব আলোচনা থেকে এটাই প্রকাশ পায় যে, এই ভারতবর্ষে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন কালপঞ্জীর প্রচলন আছে এবং ঐসব অঞ্চলের লোকেরা তাদের আঞ্চলিক কালপঞ্জী অনুসারে দিন, মাস ও বছর গণনা করে। স্বাধীনতার পরে যখন একটি সর্বভারতীয় কালপঞ্জী প্রচলন করার জন্য অনুসন্ধান শুরু হল, তখন দেখা গেল যে, সারা ভারতে এই রকম প্রায় ৩০টি আঞ্চলিক কালপঞ্জী প্রচলিত রয়েছে। যাই হোক, এই সব আঞ্চলিক কালপঞ্জীর সাহায্যে সারা দেশের সরকারি কাজকর্ম চালানো সম্ভব নয়। তাই সেই ক্ষেত্রে বৃটিশ সরকার দ্বারা প্রবর্ত্তিত ইংরাজি কালপঞ্জীই ব্যবহৃত হতে থাকল। তাই বর্তমানে আমরা স্কুল, কলেজ, অফিস-আদালত এবং ব্যক্তিগত কাজকর্মের ব্যাপারে ইংরাজি কালপঞ্জী ব্যবহার করে চলেছি। বিগত ব্রিটিশ পরাধীনতার সময় থেকেই এটা চলে আসছে।

গ্রেগরিয়ান কালপঞ্জী

এই ইংরাজি কালপঞ্জীর প্রকৃত নাম গ্রেগরিয়ান কালপঞ্জী বা গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার। প্রকৃতপক্ষে এই কালপঞ্জীর সূত্রপাত হয়েছিল খ্রিস্টের জন্মের ৭৫৩ বছর আগে রোম নগরীর পত্তনের সময়। তখন ১০ মাস ও মোট ৩০৪ দিনে বছর গণনা করা হতো। আজও সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের নামকরণ ১০ মাসে বছর গণনার সাক্ষী হয়ে আছে।

সংস্কৃত সপ্তমকে ল্যাটিন ভাষায় বলে সেপ্টেম এবং এই সেপ্টেম থেকে মাসের নাম হয়েছে সেপ্টেম্বর। সংস্কৃত অষ্টমকে ল্যাটিন ভাষায় বলে অক্টো এবং এই অক্টো থেকে মাসের নাম হয়েছে অক্টোবর। সংস্কৃত নবমকে ল্যাটিন ভাষায় বলে নভেম এবং এই নভেম থেকে মাসের নাম হয়েছে নভেম্বর। সংস্কৃত দশমকে ল্যাটিন ভাষায় বলে ডিসেম এবং এই ডিসেম থেকে মাসের নাম হয়েছে ডিসেম্বর। কাজেই সেই কালে সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর— এই চারটি মাস ছিল বছরের সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম মাসে। এ থেকে আরও একটা বিষয় পরিষ্কার হয় এবং তা হল, এই ভারতবর্ষ থেকেই পাশ্চাত্য অক্ষর গুনতে শিখেছে।

যাই হোক, আমরা জানি যে, প্রায় ৩৬৫ দিনে এক সৌর বছর হয়। তাই ৩০৪ দিনে বছর গণনা করার ফলে সূর্যের গতি ও ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে এই বছর গণনার খুবই অমিল হতে থাকল। তাই খ্রিঃ পূঃ ৪৬ সালে জুলিয়াস সিজার তাঁর নামে ৩১ দিনের একটা মাস জুলাই এই কালপঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত করে দেন। পরে অগাস্টাস সিজার তার নামে ৩১ দিনের আরও একটা মাস আগস্ট এই কালপঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত করে দেন। কাজেই এর ফলে ৩৬৬ দিনে বছর গণনা শুরু হলো এবং এর নাম হলো জুলিয়ান ক্যালেন্ডার। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ১২ মিনিট ও ১০.৮ সেকেন্ড। একেই বলে ১ সৌরবছর। তাই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে ৩৬৬ দিনে বছর গুনলে সূর্যের গতি ও ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে এই বছর গণনার অমিল থাকবেই।

এই অসুবিধা দূর করার জন্য ১৫৬২ সালে পোপ ১৩শ গ্রেগরি জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের সংস্কার করলেন। তিনি সাধারণ বছরগুলি ৩৬৫ দিন এবং চতুর্থ বা লীপ ইয়ারগুলি ৩৬৬ দিন হিসাবে; অর্থাৎ ৩৬৫ ও ১/৪ দিন বা ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টার বছর গণনা হিসাবে গণনা চালু করলেন। তখন এর নাম হল গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে, ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ১২ মিনিট ও ১০.৮ সেকেন্ডে এক সৌরবছর হয়। কাজেই পৃথিবীর বাৎসরিক পরিক্রমণের সঙ্গে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের গরমিল কম হলেও থেকেই গেল। বিগত ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে এই গরমিল হয়ে গেল ১১ দিনের। ওই বছর ৪ সেপ্টেম্বরকে ১৫ সেপ্টেম্বর হিসাবে গণনা করে সামঞ্জস্য বিধান করা হলো।

তখন ইংল্যান্ড বাদে সমগ্র পশ্চিম ইয়োরোপেই এই সংস্কার করা হয়েছিল। ইংল্যান্ডে এই সংস্কার করা হয় ১৭৫১ সালে। ওই বছর ১ সেপ্টেম্বরের পরের দিন ১৫ সেপ্টেম্বর

গণনা করা হয়। এই কারণে ইংল্যান্ডে একটা রসিকতা প্রচলিত আছে। তাতে বলা হয়, ১৭৫১ সালের ১ সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ডের মানুষ ১৫ দিন ধরে ঘুমিয়েছে। কারণ তারা ১ সেপ্টেম্বর রাতে ঘুমিয়েছে আর ঘুম থেকে উঠেছে ১৫ সেপ্টেম্বর।

পূর্ব ইয়োরোপে এই সংস্কার করা হয় ১৯১৭ সালে, যখন গরমিল হয়ে গিয়েছিল ১৩ দিনের। সকলেরই জানা আছে যে, ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। পঞ্জিকা সংস্কারের আগে অক্টোবর মাসের ২৪ ও ২৫ তারিখে এই বিপ্লব হয়েছিল। কিন্তু পঞ্জিকা সংস্কারের পরে তা হয়ে যায় ৬ ও ৭ নভেম্বর। এই কারণে কমিউনিস্টরা একে কখনো মহান অক্টোবর বিপ্লব, আবার কখনো মহান নভেম্বর বিপ্লব বলে থাকে।

এই সব আলোচনা থেকে এটাই বেরিয়ে আসে যে, আকাশে সূর্যের বার্ষিক পরিক্রমণের সঙ্গে গ্রেগরিয়ান কালপঞ্জীর সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য বিধান করা কখনোই সম্ভব নয়। এর কারণ কী? এর কারণ হল, এই কালপঞ্জীর কোন মাস কত দিনে হবে তা আমরা ঘরে বসে নিজের ইচ্ছানুসারে ঠিক করছি, সূর্যের অবস্থানের উপর নির্ভর করে তা করছি না। সূর্যের বার্ষিক পরিক্রমণের সঙ্গে কোনো কালপঞ্জী তখনই সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে যখন সেই কালপঞ্জীর মাসগুলো সূর্যের বার্ষিক পরিক্রমণের সঙ্গে সামঞ্জস্য হবে। এর থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, একমাত্র সেই কালপঞ্জীকেই বৈজ্ঞানিক কালপঞ্জীর আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

এখানে বলে রাখা সঙ্গত হবে যে, প্রথমে পাশ্চাত্যে খ্রিস্টান জগতের দেশগুলোতেই এই গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার চালু করা হয় এবং পলাশী যুদ্ধের মাত্র ৫ বছর আগে, ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে, তা বৃটেনের সরকারি কালপঞ্জীর স্বীকৃতি লাভ করে। তারপর বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং একটি আন্তর্জাতিক ক্যালেন্ডারের মর্যাদা লাভ করে। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, উৎকর্ষতার জন্য এই গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার আন্তর্জাতিক কালপঞ্জীর স্বীকৃতি লাভ করেনি এবং এই স্বীকৃতির পিছনে রয়েছে সামরিক শক্তি বা পেশী শক্তি।

জাতীয় কালপঞ্জীর অন্বেষণ

ব্রিটিশরা প্রায় ২০০ বছর ভারত শাসন করেছিল এবং এই ২০০ বছর ধরে ভারতকে শোষণ করে একেবারে নিঃস্ব করে ফেলেছিল। তবে ইংরেজরা তাদের দুটো জিনিস সঙ্গে করে এনেছিল যা পরোক্ষভাবে ভারতের পক্ষে উপকারী

মেঘনাদ সাহা

প্রমাণিত হয়েছে। প্রথমটা হল, তাদের ইংরাজি ভাষা, আর দ্বিতীয়টা গ্রেগরিয়ান কালপঞ্জী। আগেই বলা হয়েছে যে, ভারত হল বহু আঞ্চলিক ভাষা এবং বহু আঞ্চলিক সংস্কৃতির দেশ। ব্রিটিশরা যখন ভারতে আসে তখন এই দেশে এমন কোনো ভাষা ছিল না যা এই সমস্ত আঞ্চলিক ভাষাগুলির মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করতে পারে। ব্রিটিশদের ইংরাজি ভাষা সেই অভাব দূর করতে সাহায্য করেছে। সেই সময় ভারতে বহু আঞ্চলিক কালপঞ্জীর প্রচলন ছিল এবং সর্বভারতে গ্রহণযোগ্য কোনো কালপঞ্জী ছিল না। ব্রিটিশের দ্বারা প্রবর্তিত গ্রেগরিয়ান কালপঞ্জী সেই অভাব দূর করতে সফল হয়েছে।

যাই হোক, স্বাধীনতার পরে আমাদের জাতীয় নেতাদের মনে হল যে, বিদেশি গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের বদলে ভারতের নিজস্ব, একেবারে দেশিয় একটি কালপঞ্জী থাকা উচিত। এই চিন্তাধারার দ্বারা চালিত হয়ে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু দেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালন সংস্থা সি এস আই আর (কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ)-কে বিষয়টি খতিয়ে দেখার এবং উপযুক্ত একটি জাতীয় কালপঞ্জী অন্বেষণ করার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। সেই অনুসারে সি এস আই আর কালপঞ্জী পুনর্গঠন কমিটি (ক্যালেন্ডার রি-ফর্মেশন কমিটি) নামে একটি কমিটি গঠন করল এবং স্বনামধন্য বিজ্ঞানী ড: মেঘনাদ সাহা হলেন ওই

কমিটির চেয়ারম্যান। এছাড়া অন্য যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মেঘনাদ সাহা এই কমিটির সদস্য মনোনীত করেছিলেন তাঁরা হলেন এ সি ব্যানার্জি, কে কে দফতরি, জে এস করন্ডিকর, জি প্রসাদ, আর ভি বৈদ্য এবং এন সি লাহিড়ী। এই কমিটির দায়িত্ব ছিল প্রথমত দেশে যেসব আঞ্চলিক কালপঞ্জী প্রচলিত আছে সেগুলোকে যাচাই করা এবং তাদের মধ্যে থেকে জাতীয় স্তরে গ্রহণ করার মতো একটি কালপঞ্জী নির্বাচন করা।

পরবর্তী প্রসঙ্গে যাবার আগে দিন, মাস ও বছর গোনার পদ্ধতি সম্পর্কে পাঠকের কিছু প্রাথমিক বিষয় জানা দরকার। অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ মাস ও বছর গোনার কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে। সাধারণ মানুষের কাছে, খালি চোখেও চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি খুবই প্রকট। তাই তারা চন্দ্রকলার সাহায্যেই মাস গণনা শুরু করে। যেমন এক পূর্ণিমা থেকে পরের পূর্ণিমা পর্যন্ত ১ মাস, অথবা এক অমাবস্যা থেকে পরের অমাবস্যা পর্যন্ত ১ মাস। জ্যোতিষ বিজ্ঞানের ভাষায় একে ১ চান্দ্রমাস বলে। এক অমাবস্যা থেকে পরের অমাবস্যা পর্যন্ত ১ মাসকে ১ অমান্ত মাস এবং এক পূর্ণিমা থেকে পরের পূর্ণিমা ১ মাসকে ১ পূর্ণিমান্ত মাস বলে। এরকম ১২টা চান্দ্র মাসকে একত্রে ১ চান্দ্র বছর বলে। প্রায় ৩৫৫ দিনে ১ চান্দ্র বছর হয়।

ভারতীয় সব কালপঞ্জীর একটি বৈশিষ্ট হল চান্দ্র দিন বা তিথি গণনা। এটা সকলেরই জানা আছে যে, অমাবস্যার দিন সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যবর্তী কোণের পরিমাণ হয় ০ ডিগ্রি এবং পূর্ণিমার দিন এই কোণের পরিমাণ হয় ১৮০ ডিগ্রি। পরবর্তী অমাবস্যার দিন এই কোণের পরিমাণ হয় ৩৬০ ডিগ্রি। অর্থাৎ এক অমাবস্যা থেকে পরের অমাবস্যার মধ্যে চন্দ্র ৩৬০ ডিগ্রি পথ অতিক্রম করে। আমাদের জ্যোতির্বিদরা এই ৩৬০ ডিগ্রি পথকে ১২ ডিগ্রি করে ৩০টি সমান ভাগে ভাগ করেছেন এবং এই ১২ ডিগ্রি পথ অতিক্রম করতে চন্দ্রের যে সময় লাগে তাকে এক চান্দ্র দিন বা তিথি নামে অভিহিত করেছেন। এক তিথির স্থায়িত্ব হয় প্রায় ২৩ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ২৮ সেকেন্ড। হিন্দুর সমস্ত পূজা অর্চনা, সব ধর্মীয় উৎসবাদি তিথি অনুসারেই পালন করা হয়ে থাকে। এব্যাপারে আরও বলে রাখা দরকার যে, ভারতে প্রচলিত যত কালপঞ্জী আছে তার সব কালপঞ্জীতেই মাসগুলোর নাম একই— বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র।

আমরা জানি যে, পৃথিবী তার বার্ষিক গতিতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু পৃথিবী থেকে মনে হয় যে, পৃথিবী স্থির আছে আর সূর্য আকাশের স্থির নক্ষত্রদের সাপেক্ষে বছরে একবার সারা আকাশকে প্রদক্ষিণ করছে। সূর্য আকাশে যে পথ ধরে বার্ষিক প্রদক্ষিণ করে, ইংরাজিতে তাকে বলে একলিপটিক এবং ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাকে বলে বৈশ্বানর পথ। এই বৈশ্বানর পথের কৌণিক বিস্তৃতি ৩৬০ ডিগ্রি। এই ৩৬০ ডিগ্রি পথকে ৩০ ডিগ্রি করে ১২টি সমান অংশে ভাগ করা হয়েছে এবং এই ১২টি অংশকে বলে রাশি। ভারতীয় মতে, এই ১২টি রাশির নাম হল মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। সূর্যের এই বার্ষিক ভ্রমণকালে এক এক রাশিতে অবস্থানের সময়কে এক সৌরমাস বলে এবং সমগ্র বৈশ্বানর পথকে একবার পরিভ্রমণের সময়কে এক সৌর বছর বলে।

অন্য দিক দিয়ে এটাও বলা যায় যে, পৃথিবী তার বার্ষিক গতিতে বছরে ১বার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এভাবে ১বার সূর্যকে পূর্ণ প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর যে সময় লাগে তাকে ১ সৌরবছর বলে। প্রায় ৩৬৫ দিনে ১ সৌর বছর হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ১ চান্দ্র বছর ১ সৌর বছর থেকে ১০ দিন কম। তাই কোন সৌর কালপঞ্জীর সাপেক্ষে কোন চান্দ্র কালপঞ্জী প্রত্যেক বছর ১০ দিন করে এগিয়ে যাবে। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল যে, সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার ফলেই পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তন হয় এবং ১ সৌর বছরে ৬টি ঋতু আসে। কাজেই চান্দ্র বছর গুনলে তা ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না এবং মাসের সঙ্গে ঋতুর কোনো সংযোগ থাকবে না।

ভারতে যে সমস্ত কালপঞ্জী প্রচলিত আছে তার মধ্যে একমাত্র ইসলামি হিজরি কালপঞ্জীই চান্দ্র। তাই ৩৫৫ দিনে ১ হিজরি বছর হয় এবং সব মুসলমান উৎসব প্রতি বছর ১০ দিন করে এগিয়ে যায়। এবছর যেদিন ইদ হবে, পরের বছর তার ১০ দিন আগে ইদ হবে। তাই দেখা যায় যে, মুসলমানরা কোনো বছর গরমকালে, আবার কোনো বছর শীতকালে ইদ পালন করছে। যদি কোনো বছর জানুয়ারির ১০ তারিখের মধ্যে ইদ হয় তবে সেই বছর ডিসেম্বরের শেষে আবার ইদ হবে। অর্থাৎ একই বছরে দু-বার ইদ হবে। এই হিজরি কালপঞ্জী অমান্ত এবং এক অমাবস্যা থেকে পরবর্তী অমাবস্যা পর্যন্ত এক মাসের স্থায়িত্ব। অমাবস্যার পর দিন অর্থাৎ শুক্লা প্রতিপদের দিন মাস শুরু হয় এবং পরের অমাবস্যার দিন মাস শেষ হয়।

পৃথিবীতে যত রকমের কালপঞ্জী প্রচলিত আছে সেগুলোকে মোটামুটি ৩ ভাগ করা চলে। যথা সৌর, চান্দ্র-সৌর এবং চান্দ্র। যে কালপঞ্জীর বছর ও মাস দুই সৌর, তাকে সৌর কালপঞ্জী বলে। যেসব কালপঞ্জীর মাস চান্দ্র কিন্তু বছর সৌর, তাকে চান্দ্র-সৌর এবং যে কালপঞ্জীর মাস ও বছর, দুই চান্দ্র,

তাকে চান্দ্র কালপঞ্জী বলে। আমরা বাঙালিরা যে বঙ্গাব্দ গণনা করি, তার বছর ও মাস দুই সৌর। তাই বঙ্গাব্দ একটি বিশুদ্ধ সৌর কালপঞ্জী। ওড়িশা ও অসমের মানুষ যে কালপঞ্জী অনুসরণ করে তাও সৌর।

বিক্রম সম্বৎ

সমগ্র উত্তর ভারতে অর্থাৎ হিন্দিভাষী অঞ্চলে যে কালপঞ্জী সর্বাপেক্ষা অধিক মানুষ অনুসরণ করে তার নাম বিক্রম সম্বৎ। সম্বৎ শব্দটি সংস্কৃত সম্বৎসর থেকে এসেছে। এই বিক্রম সম্বৎ হল চান্দ্র-সৌর কালপঞ্জী এবং এর বছরটি সৌর, কিন্তু মাসগুলো চান্দ্র এবং অমান্ত। প্রত্যেক অমাবস্যার পর দিন অর্থাৎ শুক্ল প্রতিপদের দিন নতুন মাস শুরু হয় এবং পরবর্তী অমাবস্যার দিন মাস শেষ হয়। এই বিক্রম সম্বতের সঙ্গে গ্রেগরিয়ান কালপঞ্জীর প্রায় ৫৭ (৫৬.৭) বছরের তফাত। একটা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা বোঝানো যেতে পারে। গত ২০৫৬ বিক্রম সম্বৎ গ্রেগরিয়ান কালপঞ্জীর ১৯৯৯ সালে শুরু হয় এবং ২০০০ সালে শেষ হয়। কাজেই বলা যেতে পারে প্রায় ৫৭ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে এই বিক্রম সম্বৎ গণনা শুরু হয়েছিল। চৈত্র মাসের শুক্ল প্রতিপদের দিন (গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের মার্চ-এপ্রিল মাসে) সম্বতের নতুন বছর শুরু হয়। এবং এই দিন থেকে সমগ্র উত্তর ভারতে নয় দিন ব্যাপী নবরাত্রি উৎসবের সূচনা হয়।

আগে অনেকেই মনে করতেন যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই বিক্রম সম্বতের জন্মদাতা। কিন্তু বিক্রম সম্বতের শুরু হয়েছিল খ্রিঃ পূঃ ৫৭ সালে এবং বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চান্দ্রগুপ্ত রাজত্ব করেছিলেন অনেক পরে, ৩৮০-৪১৫ খ্রিস্টাব্দে। তাই এই ব্যাপারে রমেশ চন্দ্র মজুমদার ও অন্য ঐতিহাসিকগণ জৈন তপস্বী কালকাচার্য বর্ণিত আখ্যানকেই সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। এই আখ্যানে বলা হয়েছে যে, কালকাচার্যের বোন সরস্বতী ছিলেন অতিশয় বিদূষী এবং অতীব সুন্দরী। উজ্জয়িনীর রাজা গর্দভিল্ল সরস্বতীর রূপে মুগ্ধ হন এবং তাকে অপহরণ করে উজ্জয়িনীতে নিয়ে যান। ভগ্নীকে মুক্ত করার জন্য কালকাচার্য শকদের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং শক রাজা উজ্জয়িনী অধিকার করে সরস্বতীকে উদ্ধার করেন এবং গর্দভিল্লকে বন্দী করেন। কথিত আছে যে, শক রাজা পরে গর্দভিল্লকে মুক্ত করে দেন। মুক্তি পেয়ে গর্দভিল্ল বনে পালিয়ে যান এবং সেখানে তাঁকে বাঘে খেয়ে নেয়। যাই হোক, পরে খ্রিস্টপূর্ব ৫৭ সালে গর্দভিল্লর পুত্র বিক্রমাদিত্য শক রাজাকে পরাজিত করে উজ্জয়িনী পুনর্দখল করেন। এই

নেপালের গোর্খা রাজা পৃথ্বী নারায়ণ শাহর স্বর্ণমুদ্রার ছবি। যাতে শকাব্দ ১৬৮৫ (অর্থাৎ ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দ) অঙ্কিত আছে।

যুদ্ধে শকদের পরাজিত করার স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করে রাখতে বিক্রমাদিত্য বিক্রম সম্বৎ বর্ষ গণনা চালু করেন।

অনেকের মনে এই প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কেন গাধার নামে একজন রাজার নাম গর্দভিল্ল হল? এর কারণ হল যে, রাজা গর্দভিল্লর একটি মায়াবী গাধা ছিল এবং সে সেই গাধাটির সাহায্যে নানা রকমের মায়াবী কাজকর্ম করতে পারতো। বিশেষ করে যুদ্ধের সময় সে ওই গাধাটিকে এত জোরে চিৎকার করাতে পারত যে সেই শব্দে শত্রু সৈন্য মরে যেত বা ভয়ে পালিয়ে যেত। কিন্তু শকদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় গাধাটা হা করার সঙ্গে সঙ্গে শকরা তার মুখে অনেক তির মেরে তার মায়াবী শক্তি নষ্ট করে দেয় এবং গর্দভিল্ল যুদ্ধে হেরে যায়।

আগেই বলা হয়েছে যে, বিক্রম সম্বতের মাসগুলো চন্দ্র, কিন্তু বছরগুলি সৌর। কাজেই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, সৌর বছরের সঙ্গে চান্দ্র মাসের সামঞ্জস্য বিধান করা হচ্ছে কীভাবে? আমাদের জানা আছে যে, প্রায় ৩৬৫ দিনে ১ সৌর বছর হয় এবং প্রায় ৩৫৫ দিনে ১ চান্দ্র বছর হয়। অর্থাৎ ১ চান্দ্র বছর ১ সৌর বছরের থেকে ১০ দিন কম। কাজেই ৩ সৌর বছরের থেকে ৩ চান্দ্র বছর ৩০ দিন কম হবে। অথবা ১ চান্দ্র মাস কম হবে। অর্থাৎ ৩ সৌর বছরে ৩৬টা সৌর মাস হবে, কিন্তু ৩৭টা চান্দ্র মাস হবে। কাজেই প্রত্যেক তৃতীয় বছরে যদি ৩৭তম চান্দ্রমাসকে বাদ দেওয়া যায় তবে চান্দ্রমাস ও সৌর বছরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব।

আমাদের দেশে ওই ৩৭তম (অথবা তৃতীয় বছরের ১৩তম) মাসে সব রকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় কাজকর্ম বর্জন করে মাসটিকে পরিত্যাগ করা হয়। সংস্কৃতে এ মাসটিকে অধিক মাস বা মলিম্লুচ মাস বলে। বাংলায় বলে মলমাস। ইংরাজিতে একে Intercalary month এবং এই পদ্ধতিটিকে

Triennial Intercalation বলে। বাংলায় বলা চলে ত্রৈবার্ষিক মলমাস করণ। পাঠকের হয় তো স্মরণ থাকতে পারে যে, এক বছর মহালয়ার প্রায় ১ মাস পরে দুর্গা পুজো হয়েছিল। মহালয়া হয় অমাবস্যার দিন এবং অমাবস্যার পরদিন অথবা শুক্ল প্রতিপদের দিন, নতুন চান্দ্র মাস শুরু হয়। ওই বছর অমাবস্যার পরদিন যে মাস শুরু হল সেটাই মলমাস হিসাবে বাদ চলে গেল। তাই তার পরের অমাবস্যার পরের শুক্ল সপ্তমীতে সপ্তমী পুজো হয়েছিল।

প্রাক ইসলামি আরবেও চান্দ্র মাস গণনা করা হতো এবং ত্রৈবার্ষিক মলমাস করণের মাধ্যমে সৌর বছর গণনা করা হতো। পরে কোরানের বাণী অবতীর্ণ হল যে, আল্লা হলেন মাস ও বছরের সৃষ্টিকর্তা, তাই আল্লার সৃষ্টির ওপর মানুষের কলম চালাবার অধিকার নেই। এই বাণীর ফলে মলমাস করণের প্রথা পরিত্যক্ত হল এবং ইসলামি বছর সম্পূর্ণ চান্দ্র বছরে পরিণত হল। ফলে হিজরি সাল গণনার সঙ্গে ঋতু পরিবর্তনের কোনো সংযোগ থাকল না। তাই কেউ যদি বলে যে, ইতিহাসের ঐ ঘটনা হিজরির অমুক সনের অমুক মাসে ঘটেছিল, তা হলে এটা নির্ণয় করা সম্ভব হয় না যে ওই ঘটনা গ্রীষ্মকালে ঘটেছিল না শীতকালে ঘটেছিল।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, কোনো কৃষিভিত্তিক সমাজের পক্ষে সৌর বছর গণনা অত্যন্ত আবশ্যিক, কারণ বার্ষিক ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে কৃষিকাজ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আরবের মাটি মরু সদৃশ এবং সেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও নামমাত্র। তাই আরবে কৃষিকাজ হয় না এবং এই কারণে আরব সমাজ সভ্যতার ব্যাপারে পশুপালকের স্তরেই পড়ে আছে, কৃষির স্তরে উন্নীত হতে পারেনি। এই কারণে চান্দ্র হিজরি সন গণনা বা অনুসরণ করতে তাদের কোনো অসুবিধা হয় না। তাই তারা আজও চান্দ্র হিজরি সন গণনা করে চলেছে। কিন্তু বাংলাদেশ ইসলামি দেশ হলেও কৃষিভিত্তিক। তাই সেখানকার মানুষ শুধু ধর্মীয় কাজকর্মে হিজরি ব্যবহার করে এবং দৈনন্দিন কাজের বেলায় সৌর বঙ্গাব্দ কালপঞ্জীই অনুসরণ করে থাকেন। বাংলাদেশের মানুষ পয়লা বৈশাখের দিনই নববর্ষ উৎসব পালন করে।

শকাব্দ

শকাব্দ নামে ভারতে আর একটি কালপঞ্জী চালু আছে যার মাস ও বছর দু-ই সৌর। এই শকাব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ঘোরতর মতবিরোধ আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে বিদেশি আক্রমণকারী শক নামে এক জাতির উল্লেখ আছে, যারা ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বিস্তীর্ণ ভূভাগ দখল করে রাজত্ব করেছিল। অনেকের মতে, এই শকদের কোনো রাজা শকাব্দের প্রবর্তক। অনেকে আবার মনে করেন যে, কোনো ভারতীয় রাজা এই শকদের যুদ্ধে পরাস্ত করে ভারত থেকে বিতাড়িত করেন এবং এই বিজয়ের স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে তিনি শকাব্দের প্রবর্তন করেন।

বর্তমান গ্রেগরিয়ান বছরের থেকে ৭৮ বিয়োগ করলে শকাব্দের বছর পাওয়া যায় এবং এ থেকে প্রমাণ হয় যে, ৭৮ খ্রিস্টাব্দ এই শকাব্দ কাল গণনা শুরু হয়েছিল। এক কালে প্রায় সব ঐতিহাসিকই এই মত পোষণ করতেন যে, কুশান সম্রাট কনিষ্ক ৭৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসন আরোহন করেন এবং সেই স্মৃতিতে স্মরণীয় করে রাখতে শকাব্দ কালপঞ্জী শুরু করেন। কিন্তু পরবর্তী গবেষণা, বিশেষ করে হেনরি ফক-এর গবেষণা থেকে প্রমাণ হয় যে, কনিষ্ক সিংহাসন আরোহণ করেছিলেন ১২৭ খ্রিস্টাব্দে। তাছাড়া কনিষ্ক জাতিতে শক ছিলেন না, ছিলেন কুশান। তাই কনিষ্ক শকাব্দের প্রবর্তন করেছিলেন তা মেনে নেওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে।

অন্য আরেকটি মতে বলা হয়, সম্রাট শালিবাহন এই শকাব্দের প্রবর্তন করেন। তিনি বিদেশি শকদের যুদ্ধে পরাস্ত করে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন এবং সেই বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখতে শকাব্দের প্রবর্তন করেন। আর একটি মতে বলা হচ্ছে যে, সম্রাট বিক্রমাদিত্য ৭৮ খ্রিস্টাব্দে শকদের যুদ্ধে পরাস্ত করে ভারত থেকে বিতাড়িত করেন এবং সেই বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখতে শকাব্দের প্রবর্তন করেন। (ইনি যে বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন না, তা বলাই বাহুল্য)। ব্রহ্মগুপ্ত (৭ম শতাব্দী) ও আল বিরুনির (১০ম ও ১১শ শতাব্দী) লেখাতেও এই মত ব্যক্ত করা হয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, শকাব্দের প্রবর্তনকারী কে সেই ব্যাপারে অনেক মতবিরোধ রয়েছে। তবে বর্তমানে বেশিরভাগ ঐতিহাসিকই মনে করেন যে, সম্রাট শালিবাহন যে কালপঞ্জীর প্রবর্তন করেছিলেন তাই আজকের শকাব্দ।

তবে কে শকাব্দের প্রবর্তন করেছিলেন তা বর্তমান প্রবন্ধে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই শকাব্দ কালপঞ্জীর মাস ও বছর দু-ই সৌর এবং ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার নেতৃত্বে যে কালপঞ্জী পুনর্গঠন কমিটি (ক্যালেন্ডার রিফর্ম কমিটি) গঠন করা হয়েছিল সেই কমিটি শকাব্দকেই ভারতের জাতীয় কালপঞ্জী হিসাবে গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়। এবং সেই হিসাবে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার শকাব্দকে ভারতের জাতীয় কালপঞ্জী হিসাবে

ঘোষণা করে এবং সরকারি কাজকর্মে শকাব্দের ব্যবহারকে বাধ্যতামূলক বলে আদেশ জারি করে। নীচে শকাব্দের বছর ও মাসের বিন্যাস দেখানো হলো :

	মাস	দিন	মাসের ১ম দিন
১	চৈত্র	৩০/৩১	২২শে মার্চ
২	বৈশাখ	৩১	২১শে এপ্রিল
৩	জ্যৈষ্ঠ	৩১	২২শে মে
৪	আষাঢ়	৩১	২২শে জুন
৫	শ্রাবণ	৩১	২৩শে জুলাই
৬	ভাদ্রপদ	৩১	২৩শে আগস্ট
৭	আশ্বিন	৩০	২৩শে সেপ্টেম্বর
৮	কার্তিক	৩০	২৩ অক্টোবর
৯	অগ্রহায়ণ	৩০	২২শে নভেম্বর
১০	পৌষ	৩০	২২শে ডিসেম্বর
১১	মাঘ	৩০	২১শে জানুয়ারি
১২	ফাল্গুন	৩০	২০শে ফেব্রুয়ারি

সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শকাব্দের ১২টি মাসের নাম চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন। বছরের প্রথম মাস চৈত্র, তাই পয়লা চৈত্র নববর্ষ। সাধারণ বছরগুলিতে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র— এই পাঁচ মাস ৩১ দিনে এবং বাকি মাসগুলো ৩০ দিনে। তাই সাধারণ বছরগুলিতে ৩৬৫ দিনে বছর হবে। প্রত্যেক চতুর্থ বছরে বা লিপ ইয়ারে চৈত্র মাস ৩১ দিনে হবে, তাই সেই বছরগুলিতে ৩৬৬ দিনে বছর হবে। তাই গ্রেগরিয়ান কালপঞ্জীর মতো এখানেও ৩৬৫ দিন ও ৬ ঘণ্টায় (১/৪ দিন) বছর গোনা হবে। তাই এই কালপঞ্জীর সঙ্গে গ্রেগরিয়ান কালপঞ্জীর কোনো তফাত নেই। এটা আরও প্রকট হয় যখন দেখা যায় মাসগুলোর আরম্ভের তারিখ গ্রেগরিয়ান কালপঞ্জীর তারিখের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

আরও একটা লক্ষণীয় বিষয় হল, গ্রেগরিয়ান কালপঞ্জীতে যেমন আকাশে সূর্যের অবস্থানের সঙ্গে মাসগুলির কোনো সম্বন্ধ নেই, এখানেই ঠিক তাই। তবে গ্রেগরিয়ান কালপঞ্জীতে যেমন কোনো মাস ৩০ দিনে আর কোনো মাস ৩১ দিনে তার কোনো নিয়মশৃঙ্খলা নেই, শকাব্দতে তা নয়। এখানে পর পর ৭ মাস ৩০ এবং পর পর ৫ মাস ৩১ দিনে করা হয়েছে। কেন এরকম করা হয়েছে তার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া চলতে পারে।

পৃথিবী সূর্যকে উপবৃত্তাকার পথে প্রদক্ষিণ করছে। তাই সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সব সময় এক থাকে না। প্রায় ৬ মাস পৃথিবী সূর্যের কিছুটা কাছে থাকে এবং বাকি ৬ মাস কিছুটা দূরে থাকে। পৃথিবী সূর্যের কাছে এলে তার গতি বেড়ে যায় এবং এক রাশির ৩০ ডিগ্রি পথ পার হতে কম সময়, প্রায় ৩০ দিন লাগে। তাই মাসগুলো ৩০ দিনে হয়। পরের ৬ মাস পৃথিবী সূর্য থেকে একটু দূরে চলে যায় বলে পৃথিবীর গতি কমে যায় এবং সেই একই পথ অতিক্রম করতে ৩১ দিন লেগে যায়। তাই মাসগুলোও ৩১ দিনের হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে, সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ১২ মিনিট ১০.৮ সেকেন্ড। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে লিপ ইয়ারে ১ দিন বাড়িয়ে বা ৩৬৫-১/৪ দিনে বছর গণনা করে ৬ ঘণ্টা পর্যন্ত সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। কিন্তু ১২ মিনিট ও ১০.৮ সেকেন্ড সময়ের কোনো সামঞ্জস্য বিধান করা হয়নি। এই কারণে ১৭০০ সালে পশ্চিম ইয়োরোপে, ১৭৫১ সালে ইংল্যান্ডে এবং ১৯৭১ সালে পঞ্জিকা সংস্কার করতে হয়েছে। শকাব্দের বেলায়ও চার বছর পর ১ দিন যোগ করে করে ৬ ঘণ্টা পর্যন্তই সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। তাই শকাব্দকেও গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের মতো কিছু বছর বা কয়েক শ বছর পর পর অবশ্যই পঞ্জিকা সংস্কার করতে হবে।

বাংলা সন বঙ্গাব্দ

আমরা বাঙালিরা যে বছর বা সন গণনা করি তার নাম বঙ্গাব্দ। বর্তমান বছরে বঙ্গাব্দের ১৪২৩ সন চলছে। প্রথমেই বলে রাখা দরকার, বাংলা সন গণনার বছর ও মাস দুই-ই সৌর। এটা সকলেরই জানা আছে যে, সূর্য স্থির আছে এবং পৃথিবীর বছরে একবার তাকে পাক খাচ্ছে। কিন্তু পৃথিবী থেকে মনে হয় যে, পৃথিবী স্থির আছে এবং সূর্য তাকে বছরে একবার ঘুরে আসে। আগেই বলা হয়েছে যে, আকাশের যেই বৃত্তাকার পথে সূর্য পৃথিবীকে পাক খায় তার সংস্কৃত নাম বৈশ্বানর পথ এবং ইংরাজিতে বলে একলিপ্‌টিক। যেহেতু এই পথটি বৃত্তাকার, তাই এর কৌণিক মান ৩৬০ ডিগ্রি। এই ৩৬০ ডিগ্রি পথকে আমাদের জ্যোতির্বিদগণ ৩০ ডিগ্রি করে সমান ১২টি ভাগে ভাগ করেছেন। এই ১২টি ভাগকে বলা হয় রাশি এবং ১২টি রাশির নাম হল মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন।

আমাদের বাংলা বছর ও মাস গণনা অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক। আমরা আগেই দেখেছি যে, গ্রেগরিয়ান বা শকাব্দ গণনার ক্ষেত্রে প্রকৃত দিন মাস ও বছরের সঙ্গে ক্যালেন্ডারের দিন

মাস বছর এক হয় না। চতুর্থ বা লিপ ইয়ারে একদিন যোগ করে এবং কিছু বছর বা কয়েক শত বছর পর পর পঞ্জিকা সংস্কার করে সামঞ্জস্য করতে হয়। কেন এই গরমিল হয়? এই গরমিল এই কারণে হয় যে, এই সব কালপঞ্জীর মাসগুলো কতদিনের হবে তা ঘরে বসে স্থির করা হয়, আকাশে সূর্যের অবস্থানের উপর নির্ভর করে করা হয় না। এব্যাপারে বঙ্গাব্দ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং আকাশে সূর্যের অবস্থানের উপর নির্ভর করেই বঙ্গাব্দের মাসগুলো স্থির করা হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে, পৃথিবী তার বার্ষিক গতিতে সূর্যকে বছরে একবার প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু পৃথিবী থেকে মনে হয় যে, পৃথিবী স্থির আছে আর সূর্য আকাশের স্থির নক্ষত্রদের সাপেক্ষে বছরে একবার বৈশ্বানর পথ ধরে সারা আকাশকে প্রদক্ষিণ করছে। অর্থাৎ ১২টা রাশিকে পরিক্রমণ করছে। কোনো এক রাশিতে সূর্যের প্রবেশ করাকে সংক্রমণ এবং সেই রাশি থেকে নির্গত হওয়াকে নিষ্ক্রমণ বলে। বঙ্গাব্দের বেলায় কোনো এক রাশিতে সূর্যের সংক্রমণের সময় নতুন মাস শুরু হয় এবং সেই রাশি থেকে নিষ্ক্রমণের দিন সেই মাস শেষ হয়।

সূর্য মেষ রাশিতে প্রবেশ করলে বা সংক্রমণ করলে বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস ও বাংলার নতুন বছর শুরু হয়। সূর্য যতদিন মেষ রাশিতে অবস্থান করবে, ততদিন বৈশাখ মাস চলতে থাকবে। মেষ রাশি থেকে নিষ্ক্রমণ করে সূর্য যখনই বৃষ রাশিতে সংক্রমণ করবে, সেইদিন জ্যৈষ্ঠ মাস শুরু হবে। এইভাবে চলতে চলতে সূর্য যেদিন মীন রাশিতে প্রবেশ করবে, সেই দিন চৈত্র মাস শুরু হবে এবং মীন রাশিকে অতিক্রম করে সূর্য যেদিন আবার মেষ রাশিতে প্রবেশ করবে সেইদিন আবার নতুন বছরের বৈশাখ মাস শুরু হবে। সূর্য যদি কোনো রাশিতে ৩২ দিনও অবস্থান করে, তবে ৩২ দিনে সেই মাস হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, বর্তমান ১৪২৩ সনে সূর্য বৃষ ও কর্কট রাশিতে ৩২ দিন অবস্থান করবে, তাই এই বছর জ্যৈষ্ঠ ও শ্রাবণ মাস ৩২ দিনের মাস হবে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হল, ইংরাজি বা গ্রেগরিয়ান কালপঞ্জী এবং শকাব্দ কালপঞ্জীতে বছর ও মাস গণনার সঙ্গে এরকম নৈসর্গিক কোনো ঘটনার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। তাই তাদের বছর ও মাস গণনা হেরফের হয়ে যায় এবং সংশোধন করা জরুরি হয়ে পড়ে।

অনেকের মনে হতে পারে যে, সূর্য প্রবেশ করছে মেষ রাশিতে, কিন্তু মাসের নাম বৈশাখ হচ্ছে কেন? এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, মেষ রাশির ঠিক বিপরীতে রয়েছে তুলা রাশি। তাই সূর্য যখন মেষ রাশিতে অবস্থান করবে, তখন চন্দ্র, তুলা রাশিতে গেলে পূর্ণিমা হবে। তুলা রাশিতে ৩টি নক্ষত্র আছে, তারা হল চিত্রা, স্বাতী ও বিশাখা। তাই বিশেষ করে চন্দ্র বিশাখা নক্ষত্রে গেলে পূর্ণিমা হবে। সেই অনুসারে বিশাখা থেকে মাসের নাম হয়েছে বৈশাখ। সেইরকম জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ, পূর্বষাঢ়া থেকে আষাঢ়, শ্রবণা থেকে শ্রাবণ, ভাদ্রপদ থেকে ভাদ্র, অশ্বিনী থেকে আশ্বিন, কৃত্তিকা থেকে কার্তিক, পুষ্যা থেকে পৌষ, মঘা থেকে মাঘ, উত্তর ফাল্গুনী থেকে ফাল্গুন ও চিত্রা থেকে চৈত্র মাসের নামকরণ হয়েছে। উপরের তালিকায় দেখা যাচ্ছে, অগ্রহায়ণ মাসের নাম নেই। অগ্রহায়ণ মাসের প্রকৃত নাম হলো মার্গশীর্ষ এবং মৃগশিরা নক্ষত্র থেকে এই মাসের নাম হয়েছে। কাজেই উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বাংলা বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাস ও বছর গণনা কতখানি বৈজ্ঞানিক এবং সেই তুলনায় ইংরাজি বা গ্রেগরিয়ান জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি মাস ও বছর গণনা কতখানি অবৈজ্ঞানিক। সেই বিচারে শকাব্দ গণনাও বঙ্গাব্দের তুলনায় অবৈজ্ঞানিক।

উপসংহার

বিগত ২০০ বছরের ব্রিটিশ পরাধীনতার আমলে ব্রিটিশ সরকার আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এবং শিক্ষার বিষয়বস্তুকে এমনভাবে প্রস্তুত করেছিল যাতে সেই শিক্ষা গ্রহণ করার পর এদেশের মানুষের মনে এই ধারণা সুদৃঢ় হয় যে, যা কিছু পাশ্চাত্য তাই উন্নত ও বৈজ্ঞানিক এবং যা কিছু ভারতীয় তাই-ই অবৈজ্ঞানিক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এই বদ্ধমূল ধারণার ফলেই এ দেশের মানুষ নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন এবং পাশ্চাত্যের সব কিছুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েছে। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই এই দেশের মানুষ পাশ্চাত্যের ইংরাজি বা গ্রেগরিয়ান কালপঞ্জীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং নিজস্ব কালপঞ্জী বঙ্গাব্দের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়েছে।

তাই এটা খুবই আনন্দের বিষয় যে, ভারত সরকার বিদেশি গ্রেগরিয়ান কালপঞ্জীর বদলে ভারতের নিজস্ব কালপঞ্জী শকাব্দকে জাতীয় কালপঞ্জী হিসাবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, শকাব্দ ও গ্রেগরিয়ান, কোনোটাকেই বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ বলা যায় না। অথবা কোনোটাই সূর্যের বাৎসরিক গতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সেই দিক থেকে বিচার করলে বাংলার বঙ্গাব্দ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। কাজেই বৈজ্ঞানিক বিশুদ্ধতাই যদি একমাত্র বিচার্য হয় তাহলে শকাব্দের বদলে বঙ্গাব্দকেই ভারতের জাতীয় কালপঞ্জী হিসাবে গ্রহণ করা উচিত।

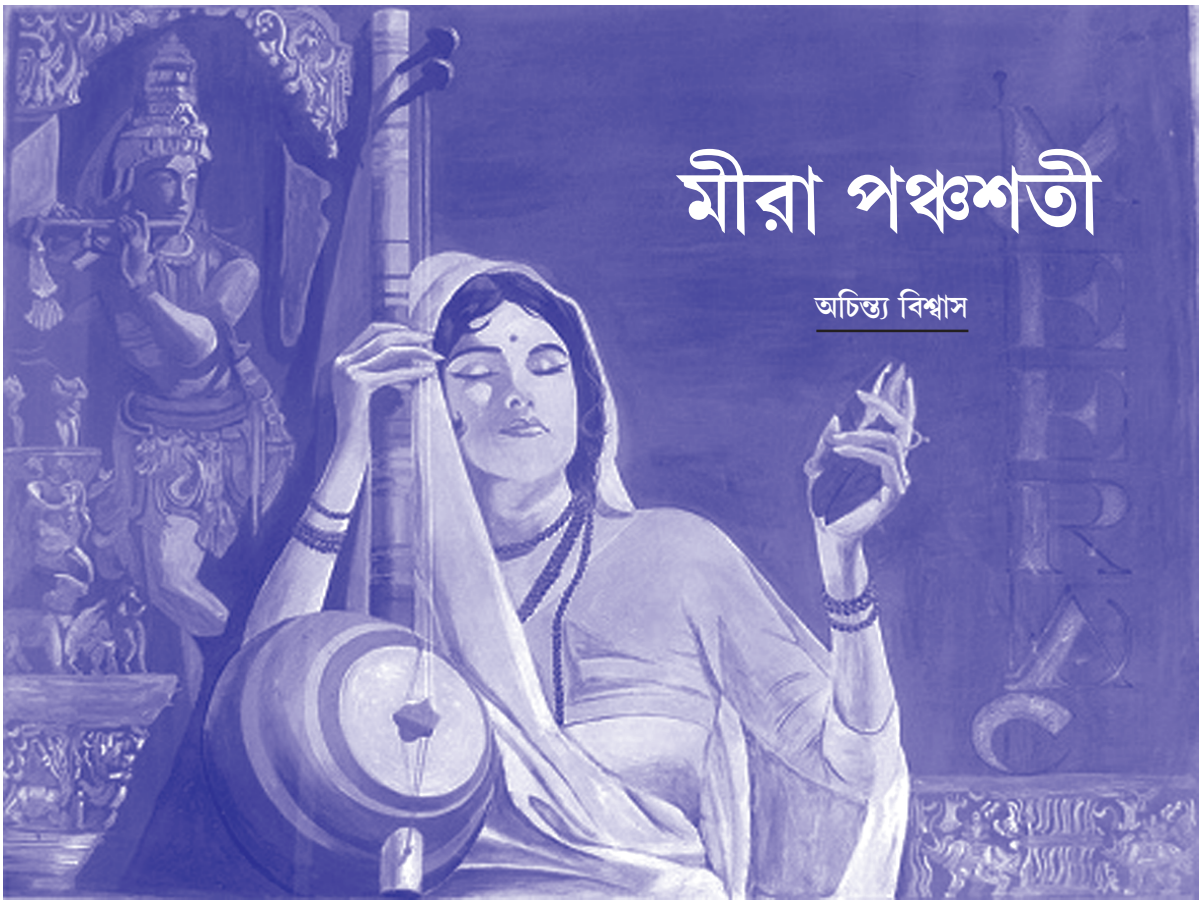

মীরা পঞ্চশতী

অচিন্ত্য বিশ্বাস

মধ্যযুগের ভারতে শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি মীরাবাঈ। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে জন্ম, তিরোধান ১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দ। এই জীবৎকালে মতান্তর আছে। কোনো কোনো গবেষকের মতে, মীরার জন্ম আরও কয়েক বছর পর ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দ। ভারত তখন শাসিত হচ্ছে বিদেশি বিধর্মী মুঘল শাসকদের দ্বারা। মীরার ভক্তি মার্গ— রহস্যবাদী মধুর সাধনা (হরিবিলাস সারদা-র ভাষায় "braidal mysticism")। সারা দেশকে আধ্যাত্মিকতার স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছে। সেই স্রোতে মিশে গেছে পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর আর দক্ষিণে সব ভক্তির ধারা। কামানের গোলা বা শাসকের তরবারি এই অপূর্ব ভারতকে কেটে খান খান বা ভূমিসাৎ করতে পারেনি। ধর্ম সাধনার দেশ ভারত দক্ষিণের বিরহভক্তির উন্মাদনা অরুণ্ডেল থেকে আরম্ভ করে আড়বার-দের দ্বারা সঞ্চারিত ঢেউ— রামানন্দের মারফত উত্তর ভারতে এসে পড়ে। গুরু রামানন্দের শিষ্য রবিদাস। মীরাবাঈ রবিদাসের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পূর্ব ভারতে তখন শঙ্করদেবের এক শরণ মহাপুরুষিয়া মত জনপ্রিয় হয়েছে— বাংলায় এসেছেন শ্রীচৈতন্যদেব। মীরাবাঈ-য়ের একটি পদে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে ভক্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সারা দেশে তখন বৈষ্ণব ভক্তিবাদের গণজাগরণ। গোকুল-মথুরা-বৃন্দাবন আর নবদ্বীপ-পুরুষোত্তমপুরী-দ্বারকায় কৃষ্ণকথার উন্মোচন। সাধারণ মানুষ ভক্তিপথে মুক্তি খুঁজছে— রাজনৈতিক দাসত্ব, পরধর্মীদের পীড়ন অত্যাচার মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে। মীরা এই পরিবেশের অপরূপ উচ্চারণ। ভারতবর্ষ তাঁর গানে তাৎপর্য পেয়েছে। রাজ্যাধিকার হারিয়েছে অহঙ্কারের প্রতাপের অস্ত্র ঝঞ্ঝনার শেষে— অত্যাচারী মিশে গেছে ধূলিমলিন পৃথিবীতে থেকে গেছে সুর; মীরার ভজনে দেশ এক হয়েছে।

রাজস্থানের মেড়তা রাজ্যে রাও দুদাজীর পুত্র রতন সিংয়ের কন্যা মীরাবাঈয়ের জন্ম। মাত্র তিন বছর বয়সে তাঁদের অঙ্গনে এক সাধু এসেছিলেন। মীরা সাধুর কাছে থাকা একটি গিরিধারী কৃষ্ণমূর্তি দেখে আগ্রহ প্রকাশ করলে সাধু সেটি তাঁর কাছে রেখে যান। সেইদিন মীরার জীবনপথ নির্দিষ্ট হয়ে যায়। মীরার খেলার উপকরণ না থেকে মূর্তিটি সেদিন থেকে হল তাঁর খেলার সাথী। পরের বছর একটা বরযাত্রীর দল যাচ্ছিল। শোভাযাত্রা দেখে মীরা মাকে জিজ্ঞেস করে জানলেন বর চলেছে কনের উদ্দেশে। মীরার জিজ্ঞাসা, তাঁর বিয়ে হবে

না? হবে তো কার সঙ্গে? মায়ের কথা, ওই যে খেলার সাথী— শ্রীকৃষ্ণ উনিই তাঁর দুল্‌হা— বর। মীরার মন চকিতে বদলে গেল। ঝরণা পথ পেল নদীর— নদী পথ পেল সমুদ্র সঙ্গমের। মীরা কৃষ্ণের জন্য উদ্দাম বিরহ যন্ত্রণা বোধ করতে থাকলেন। এই আশ্চর্য মনোভঙ্গি, উপলব্ধির এই চমৎকার ভারতীয় ভক্তি সাধনার মর্ম। বালিকা মীরা তা আয়ত্ত করলেন। মীরা একদিন স্বপ্ন দেখলেন, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হচ্ছে। বস্তুত এরপর মীরা অনন্য মনে কৃষ্ণকে পতিরূপে বরণ করলেন, সেই বন্ধন কোনোদিন টুটলো না।

আট বছর বয়সে মীরার মা মারা যান। তিনি পালিত হতে থাকেন ঠাকুরদা রাও দুদাজীর স্নেহচ্ছায়ায়। ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের বড় ছেলে ভোজরাজের সঙ্গে মীরার বিবাহ হয়। শ্রীকৃষ্ণমূর্তি সঙ্গে নিয়ে মীরা গেলেন শাক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত চিতোরগড়ে। আবাল্য বিশ্বাস ছেড়ে তাঁর পক্ষে অন্য কোনো দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি করা সম্ভব হল না— স্বামীকে বললেন, তাঁর বিয়ে হয়ে আছে রণছোড়জীর সঙ্গে, শ্রীকৃষ্ণই তাঁর স্বামী। অন্য কারও সঙ্গে তাঁর শারীরিক মানসিক সম্পর্ক হতে পারে না। একটি গানে আছে—

অরে রাণা পহলে ক্যোঁ ন বরজী।
নাগী গিরিধরিয়া সে প্রীত।
মার চাহে ছাড় রাণা নহীঁ রহু মৈঁ বরজী।।

আগে যদি তাকে বিয়ে করতেন স্ত্রী হিসাবে ব্যবহার করা যেত, এখন তা সম্ভব নয়। গিরিধারী গোপালের সঙ্গে প্রীতি সম্পর্ক হয়ে গেছে তাঁর। ভোজরাজ মারা যান ১৫২১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। চিতোরের ইতিহাসে মীরা-ভোজরাজের অসুখী বিবাহ ও ভোজরাজের অকাল মৃত্যুর কথা থেকে গেল।

চিতোর দুর্গে রণছোড়জী কৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে রাজকীয় সম্মান বৈভব ত্যাগ করে বিরহ-ব্যাকুল মীরা গান গেয়ে কাল কাটাতে থাকলেন। তাঁর আবেগ বিহ্বল সঙ্গীত পাথরের দেওয়াল ভেদ করে রাজস্থানের গ্রাম গ্রামান্তরে ভেসে যেতে থাকল। সহজ ভাষার এমন নিরাভরণ বাণী, আবেগের এমন উচ্চারণ ভারতবর্ষ কবীর দাস-সুরদাসের পদে, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের গানে তুলসী দাসের দোঁহায় শুনেছে— তবু এই সব ভজন আবেগের বিহ্বলতায় উপলব্ধির অভিনবত্বে সম্পূর্ণ নতুন মনে হল। মীরার ভজন ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে— বিশেষত উত্তর ভারতে। মীরার গান সুতীব্র আবেগ বিহ্বল। যখন তিনি কাককে ডেকে বলেন—

কায় কলেজো মে ঘরুঁ রে কাগা তু লে জায়।
জ্যা দেসাঁ মহ্‌রো পিয় বসে রে বে দেখে তু খায়।।

এই হৃদপিণ্ড রেখে আর কী হবে, কাক তুমি নিয়ে উড়ে যাও তাঁর সামনে। আমার প্রিয় যেখানে বাস করেন, তাঁর সামনে, তাঁকে দেখিয়ে দেখিয়ে তুমি খেও আমার হৃদপিণ্ড। এই অন্তরাবেগই মীরাকে স্বতন্ত্র পরিচিতি দিয়েছে।

যখন তিনি গেয়েছেন— 'দরস বিনু দুখন লাগে নৈত' (দর্শন না পেয়ে নয়নে বেদনা জেগে থাকে), কিংবা

তুম্‌হারে কারণ সব সুখ ছোড়য়া
অব মোহি তু ক্যুঁ তরসাবো হো।
বিরহে বিথা লাগী উপর অন্তর
সো তুম আয় বুঝাবো হো।।

(তোমার জন্য আমি সব সুখ ত্যাগ করেছি, এখন আর এমন ত্রস্ত করো না। বিরহে আমার কাছে সবই মনে হয় বৃথা— তুমি এসে আমাকে সান্ত্বনা দাও।)— তখন তাঁর মনের স্থিতি স্পষ্ট হয়ে আসে। মীরার মনোভিসায় গভীর গোপন রহস্যময়। তিনি শুনতে পান কৃষ্ণ আগমনের অপরূপ বার্তা।

সুনী হো মেঁ হরি আবন কী আরাজ

ক্রমে মীরাকে ঘিরে সমপথের ভক্তদলের আগমন ঘটে। রাজদুর্গ চত্বর ভক্তিমার্গের বিনিময়ের অঙ্গন হয়ে ওঠে। পৃথিবীর কোনো রাজশক্তিই অনুরূপ সমান্তরাল শক্তিকেন্দ্র সহ্য করে না। মীরার খ্যাতিও সংগ্রাম সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নতুন রাণা রতন সিংহ অপছন্দ করলেন। নানাভাবে নিষেধ করেও ব্যর্থ হয়ে শেষপর্যন্ত চরম সিদ্ধান্ত নিলেন রতন সিংহ। আর নয়, মীরাকে প্রাণে মেরে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

মীরার বেশ কিছু ভজনে আছে দেবর রাণা রতন সিংহের নিষ্ঠুর উদ্যোগ আর ব্যর্থতার কথা। সে সব জনশ্রুতি-নির্ভর ইতিহাসের ইঙ্গিত। সত্য মিথ্যা বিশ্বাস ও কল্পনার চমৎকারে মেশানো। কয়েকটি উদাহরণ :

১) রাণাজী ভেজা বিষকা প্যালা সো ইমরিত কর দীজ্যো জী।

২) মীরা কে প্রভু গিরধর নাগর ইমরিত কর দিয়ো জহর।

৩) রাণা ভেজা জহর পিয়ালা ইমরিত করি পী জানা।

৪) জহরকা প্যালা রাণা ভেজা ইমরত দিয়া বনায়।

৫) মীরা কে প্রভু গিরধর নাগর বিখসে অমৃত করে।

৬) বিষকা প্যালা রাণাজী ভেজা পীবত মীরা হাঁসীয়ে।

৭) রাণাজী ভেজ্যা বিষকা প্যালা কর চরণামৃত পটকী।
৮) রণে ভেজ্যা বিষ কা প্যালা পীবত মস্ত হোই।
অব তো বাত ফৈল গই জানৈ সব কোই।।

কখনো আছে বিষধর সাপ পাঠানোর প্রসঙ্গ। সেই সাপের ঝাঁপিতে মীরা শুদ্ধ মনে হাত ঢুকাতেই দেখা গেল সাপ হয়েছে শালগ্রাম। এবিষয়েও বেশ কিছু ভজন পাওয়া যায়। যেমন—

১) চরিয়া মেঁ ভেজ্যা জহর ভুজগঁম সালিগরাম কর জানা।
২) সাঁপ পিটারা রাণা ভেজ্যা মীরা হাথ দিয়া জায়
ন্হায় ধোয় জব দেখন লাগী সালিগরাম গই পায়।।

রাণা মীরার জন্য পাঠিয়েছেন শেল-শয্যা। মীরা তাতে শয়ন করেছেন। দেখা গেছে চমৎকার কাণ্ড—

সুলী সেজ রাণানে ভেজী দিজ্যো মীরা সুবায়।
সাঁঝ ভই মীরা সোবন লাগী মানো ফুল বিছায়।।

এরপর আর কী করবে রাজশক্তি? মীরার ভক্তিপথের জয় হল।

দশ বছর রাজত্ব করে ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে মারা গেলেন রাণা রতন সিংহ। এরপর রাণা হলেন মীরার অন্য দেওর বিক্রমজিৎ সিংহ। বিক্রমজিৎ আরও কঠোর প্রকৃতির মানুষ। মীরার কাজকর্মে নানা বিধিনিষেধ লাগু হল। মীরার বোন উদাবাঈকে নিয়োগ করা হল। তাঁর কাজ মীরাকে চোখে চোখে রাখা। উদাবাঈকে নিয়োগ করেও কোনো লাভ হল না। উদাবাঈ মীরার প্রভাবে রণছোড়জী শ্রীকৃষ্ণের ভজন গানে মেতে উঠলেন। জড়ো হলেন তাঁদের তিন সঙ্গিনী--- মিথুলা-চম্পা-চামেলী। তাঁদের নিয়ে ভজন কীর্তন চলল পরম উৎসাহে। মীরার কাছে তাঁরা দাবি করলেন, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে চান। মীরার গান তুঙ্গ আকুতিময় :

১) ভবনপতি তুম ধর আজো হো।
২) বন বড় ঢুঁড়ত মে ফিরী মাই দুধি নাহি পাই।
একবের দরসন দীজে সব কসর মিটি যাই।।
৩) খান পান মোহি নেক না ভারৈ
নৈনক লাগে কপাট।
তুম আঁয়া বিন সুখ নাহি
মেরে দিল বহুত উচাট।।
৪) পিয়া তেঁ কহাঁ গয়ো নেহরা লগায়
৫) জাগো বঁসী বরে ললনা জাগো মোরে প্যারে।
রজনী বীতী ভোরওয়া হৈ ঘর ঘর খুলে কিবারে।।

শেষপর্যন্ত গহন রাত্রিতে গোপাল দেখা দিলেন।

রাণা বিক্রমজিৎ শুনলেন মীরা মন্দিরে কারো সঙ্গে রঙ্গ করছেন। বস্তুত বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছে গান। মীরার দর্শনানন্দ ও সমর্পণের সঙ্গীত। অপার্থিব অপরূপ কল্পনার স্তরে তাঁর মনে হচ্ছে—

সাবণ দে রহয়ো জোরা বে।
ঘর আয়ো জী শ্যাম মোরা রে।।
উমড় ঘুমড় চুঁহু দিসা সে আয়া
গরজত হৈ ঘন ঘোরা রে।।

শ্রাবণের আড়ম্বরে প্রিয় মিলনের এই আনন্দ, বৈষ্ণব সাধনায় ভাবোল্লাস— রাণা বিক্রমজিৎ তাঁর মর্ম বুঝলেন না। উদ্যত তরবারি মন্দিরে প্রবেশ করলেন। দ্বিচারিণী বিধবা বৌদিকে তাঁর অন্যায়ের সমুচিত শাস্তি দেবেন। ভিতরে রণছোড়জীর মূর্তি আর মীরা। তাঁর গান ভেসে আসছে—

আইরে ম্যায় তো প্রেম দীবানী
মেরো দরদ ন জানে কোই...
গাইছেন তিনি :
ঝটক্যো মেরী চীর মুরারি।
গাগর রঁগ সিরতে ঝটকী, বেসর মুর গই সারী।।

আমি তো কৃষ্ণের প্রেমাভিলাষী, আমার বেদনা বোঝার মতো মানুষ নেই। কিংবা হে কৃষ্ণ মুরারি, তুমি আমার বসন এলোমেলো করে দিচ্ছ! মাথায় কলসী, সিঁথির রং নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অলঙ্কারও যাচ্ছে এলোমেলো হয়ে। রাণা এসবের মর্ম বুঝলেন না। দেখলেন বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ সহসা নরসিংহ মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছেন। তিনি মূর্চ্ছাহত হলেন।

চিতোরগড়ে বেশিদিন থাকা হল না। মীরাবাঈ ফিরলেন তাঁর পিত্রালয়ে— মেড়তায়। সেখানে তখন তাঁর কাকা বিরামদেও কর্তা। তিনিও মীরার আচরণ সহজ মনে মেনে নিতে পারলেন না। রাত্রি জেগে মীরার গীতবাদ্য তাঁর অপছন্দ। মীরা তখন কী আর করেন গিরিধারী গোপালকে নিয়ে গৃহত্যাগ করলেন। প্রথমে গেলেন বৃন্দাবন। সেখান থেকে দ্বারকায়। দ্বারকায় বহুদিন বাস করেছেন মীরা। তাঁর ভক্ত শিষ্য বেড়েছে।

নাভাজী দাসের হিন্দি 'ভক্তমালে'র একটি বিস্তৃত পরিচ্ছেদে মীরার জীবনচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে, ভক্তিভাবের গান শুনে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিবেদন স্বীকার করেছিলেন—

গান শক্তি অসম্ভব অমৃত নিন্দিত।
যাহে দ্রবীভূত হৈল শ্রীকৃষ্ণের চিত।।

(মূল হিন্দী থেকে বাংলায় পদ্যানুবাদ শ্রীলাল দাস বাবাজী)। ক্রমে তাঁর গানের খ্যাতি পৌঁছল আকবর বাদশার কাছে। সভাগায়ক তানসেনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি গেলেন মীরার গৃহে— 'বৈষ্ণবের বেশে'। তাঁর গান শুনে তানসেন পরাজয়

মানলেন :

'গান শুনি তানসেন আপনা নিন্দিলা।'

আকবর ও তানসেন চলে যাবার পর তাদের আগমন বার্তা পেলেন চিতোরের রাণা। মীরাকে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে এলেন তিনি। কিন্তু বিচিত্র কাণ্ড ঘটল তারপর।

বাঈজীর উপরে গিয়া অস্ত্র যে হানিল।

কাটিবারে থাকু কাজ অঙ্গে না ফুটিল।।

বিষপাত্র পাঠালেন রাণা। কিন্তু 'বিষ আদি খাওয়াইলা কিছুই না হয়।' এসব জনশ্রুতি রাজস্থানের মরুভূমিতে আজও শোনা যায়। বাস্তবে মীরার জীবন তাঁর সাধনার উপলব্ধির সঙ্গে মিলে মিশে আছে। দেশের মানুষ তাঁকে যেভাবে দেখেছে আর যেভাবে দেখতে চেয়েছে তার মিশ্রণেই গড়ে উঠেছে মীরার জীবনভাষ্য। এভাবেই মহৎ আধ্যাত্মিক চরিত্রের নির্মাণ ও বিনির্মাণ হয়।

নাভাজী দাস রচিত 'ভক্ত মালে' মীরার বৃন্দাবন জীবনের কিছু নতুন তথ্য পাওয়া যায়। মেড়তা ত্যাগ করে মীরা বৃন্দাবনে চলে আসেন। তাঁর বৃন্দাবন যাত্রার পর তাঁকে অনুসরণ করেন কয়েকজন রাজ অনুচর। তাদের উপর নির্দেশ ছিল মীরাকে জোর করে নিয়ে আসতে হবে। তারা সে চেষ্টা করেও সফল হননি।

ধরিয়া আনিতে চাহে ছুঁইতে না পারে।

আগুনের শিখা যেন দেহ দগ্ধ করে।।

ফিরে গেলেন তারা। রাণাও বুঝলেন মীরা বাঈকে নিয়ে তাঁর ক্ষমতার অহঙ্কার কোনো কাজেই লাগবে না।

মীরাবাঈ থেকে গেলেন বৃন্দাবনে। একবার তাঁর ইচ্ছা হল, ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য রূপ গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন— দুজনে কিছু সাধন-উপলব্ধির অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন। কিন্তু রূপ গোস্বামী তাঁকে দর্শন দিলেন না। তাঁর কথা—

'নাহি করি স্ত্রীলোকের সহিত সমভাষ।'

শুনে মীরাবাঈ ব্যথা পেলেন। তারপর পাঠালেন এক 'প্রহেলি'। বক্তব্য তাঁর আধ্যাত্মিক রহস্যময় তত্ত্বগর্ভ। বস্তুত ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দ শক্তির সৎ ও চিৎ শক্তি শ্রীকৃষ্ণে আর আনন্দশক্তি শ্রীরাধিকা রূপে বৃন্দাবনে প্রকটিত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণই এখানে পরম পুরুষ— পুরুষোত্তম, বাকি সবাই প্রকৃতি। মীরাবঈয়ের 'প্রহেলী' ভাষ্যটি এই রকম—

এতদিন শুনি নাই শ্রীমন্ বৃন্দাবনে।

আর কেহ পুরুষ আছয়ে কৃষ্ণ বিনে।।

পুরুষ কোকিল ভ্রমরাদির আগম্য।

তেহোঁ যে আইল তাহে নাহি বুঝি মর্ম।।

অত্যন্ত মর্মভেদী প্রহেলিকা। বৃন্দাবনে অন্য কোনো ভক্ত নিজেকে পুরুষ বলে দাবি করতে পারেন না— তারা সবাই শ্রীরাধামাধবের মিলন আনন্দের দর্শক। তারা সবাই 'মঞ্জরী'— ভগবৎ প্রেমের সহায়ক প্রকৃতি। রূপ গোস্বামী বুঝলেন মীরা দেবী অনন্যসাধারণ ভক্ত। তাঁকে আহ্বান করলেন। রূপ দেখলেন সেই মহিমময়ীর রূপ—

পরমাসুন্দরী বাঈ অল্প বয়েস।

যোগী উদ্দীপনে রূপের হৈল প্রেমাবেশ।।

বাংলার সহজ সাধকরা এই ভক্তদ্বয়ের মিলিত হওয়ার ব্যাপারটি আরও জনশ্রুতিমণ্ডিত করে পল্লবিত করেছেন। কর্ণাটদেশি ব্রাহ্মণ গৌড় রাজ দরবারের আমলা শ্রীরূপ গোস্বামী ছিলেন তাঁর সময়ের অত্যন্ত বড় মাপের বৈষ্ণব তাত্ত্বিক ও সংগঠক। তাঁর নেতৃত্বে মথুরা-বৃন্দাবন-গোকুলের বৈষ্ণবরা সেদিন সংগঠিত হয়েছিলেন। প্রচুর নষ্ট ও লুপ্ত তীর্থ পুনরুদ্ধার হয়েছিল। মুঘল দরবার মেনে নিয়েছিল ভারতীয় ভক্তের ধর্মাচরণের অধিকার। মীরাবাঈ আর রূপের সাধনপথের এই মিলন-সংগোষ্ঠী তাই ধর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ, পশ্চিম-পূর্ব আর দক্ষিণ ভারতের জীবনবোধের সম্মেলক বলেই মনে হয়।

মীরার গান তাঁর জীবন পরিধিকে অতিক্রম করেছে। তাঁর বহু ভজন আজও সঙ্গীতমঞ্চে গুঞ্জরিত হয়। যে ব্যাকুল প্রার্থনা ও সমর্পণে তিনি নিজেকে আবাল্য কৃষ্ণভাবিনী হয়েছেন ভারতবর্ষকে আজও তাঁর সুর ও কথা তেমনি ভগবৎ ব্যাকুলতা ছড়িয়ে চলেছে। যখন তাঁর কথা শোনা যায়—

আলী রে মেরে নৈশ বাণপড়ী।

(আহা, আমার চোখে বিঁধেছে কৃষ্ণ-রূপের তীর)। কিংবা

দরস বিনু দুখন লাগে নৈন।

জব সে তুম বিছুড়ে প্রভু মোরে কবহুঁ ন পায়ো চৈন।।

(তোমার দর্শন ছাড়া নয়ন আমার বেদনাবোধ করছে। যখন থেকে তুমি আমাকে ছেড়েছ, প্রভু, আমি কখনোই স্থির থাকতে পারিনি)।

এসব আকুতিভরা কথা ও সুর মীরাকে করেছে দেশ ও কালাতিশায়ী। মীরাবাই মধ্যযুগের ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মপথিক। পাঁচশো বছর পার করেও তিনি আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ও সঙ্গীতশিল্পকে শাসন করছেন— পাঁচশো আঠারো বছর ধরে। আগামী হাজার বছরেও তাঁর প্রভাব কমবে না।

ভালোবাসার রকমফের

রমানাথ রায়

আমাদের সরকার লালবাজারে সম্প্রতি একটি নতুন দপ্তর খুলেছে। নাম— প্রেম ও বিবাহ দপ্তর। এই দপ্তরে মেয়েরা তাদের প্রেম ও বিবাহ সংক্রান্ত সব অভিযোগ জানাতে পারে। কিন্তু ছেলেদের কোনো অভিযোগ গ্রাহ্য হয় না। কেন গ্রাহ্য হয় না তা আমি জানি না। আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি? আমরা তো মেয়েদের সব দাবি মেনে নিয়েছি। মেনে নিয়েছি কন্যা পুত্রেরা সমান। এখন আবার বলা হচ্ছে, মেয়েদের স্থান অনেক উঁচুতে। আর এই কারণেই আমি বিয়ে করতে পারছি না। বিয়ে করতে ভয় পাচ্ছি। অথচ রূপা আমাকে বিয়ে করার জন্য

চাপ দিচ্ছে। চাপ দিচ্ছে দিনের পর দিন। ফলে যত চাপ দিচ্ছে তত ভয় পেয়ে যাচ্ছি। আমি তাই মোবাইলে রূপা ফোন করলে ফোন ধরি না। মেসেজ পাঠালে কোনো সাড়াশব্দ করি না। এমনকী ফেসবুকে কিছু লিখলেও চুপ করে থাকি। বাড়িতে দেখা করতে এলেও দেখা করি না। কাজের লোক দরজা খুলে বলে দেয়, বাড়ি নেই। কিন্তু রূপা ছাড়বার পাত্রী নয়। মাঝে মাঝে ভাবি, সারা পৃথিবীতে কত পুরুষ আছে। আমাকে ছেড়ে তাদের কাউকে ধরলেই পারে। ধরলে আমার যে খুব একটা ভালো লাগবে তা নয়। একটু দুঃখ পাব। কারণ আমিও যে রূপাকে ভালোবাসি। তবে বিয়ে করতে চাই না। জানি, রূপা আমার ওপর রেগে যাবে। রেগে গিয়ে কী যে করবে তার ঠিক নেই। হয়ত একদিন প্রেম ও ভালোবাসা দপ্তরে গিয়ে হাজির হবে। আমাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে। তাই আর এগিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। খারাপ লাগলেও ভালোবাসার ইতি টানা দরকার।

কিন্তু ইতি টানব বললেই ইতি টানা যায় না। আগেকার দিন হলে সম্ভব হত। এখন আর সম্ভব নয়। একদিন তা বুঝতে পারলাম।

সেদিন অফিসে কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করছিলাম। এমন সময় আমার মোবাইল বেজে উঠল। ফোন ধরলাম।

— হ্যালো...

— আমি লালবাজার থেকে বলছি।

লালবাজারের নাম শুনে ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম, কেন? আমি কী করেছি?

ওদিক থেকে ধমকের গলা শুনতে পেলাম— আপনি জানেন না, কী করেছেন?

— বিশ্বাস করুন, আমি কিছু জানি না।

— মিথ্যে কথা। আপনি সব জানেন। আপনি একটা ক্রিমিনাল।

— সত্যি বলছি, আমি ক্রিমিনাল নই। আমি কোনো খুন করিনি, ডাকাতি করিনি, চুরি করিনি, ঘুষ নিইনি, আমি একেবারে সাধারণ মানুষ।

— এসব আপনি করেননি ঠিকই। কিন্তু আপনি একজন প্রতারক।

— প্রতারক! আমি!

— হ্যাঁ।

— আপনি এবার অনুগ্রহ করে বলুন, আমি কার সঙ্গে প্রতারণা করেছি?

— রূপা আপনার কে হয়?

এবার আমার কাছে সব স্পষ্ট হল। বললাম, রূপাকে একসময় আমি ভালোবাসতাম। এখন আর... মাঝে....

— বুঝতে পেরেছি। এখন আর রূপাকে ভালো লাগছে না। এখন অন্য মেয়েকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাই তো?

— একথা ঠিক নয়।

— ঠিক কী বেঠিক তা কালই প্রমাণ হয়ে যাবে।

— কীভাবে?

— কাল বেলা বারোটায় লালবাজারের প্রেম ও বিবাহ দপ্তরে চলে আসুন। রূপাও থাকবেন।

— কাল যে আমার অফিস আছে।

— অফিস কামাই করে আসবেন।

— আমি কথা দিতে পারছি না।

— তাহলে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হবে।

— দেখুন, এই কাজটা করবেন না। আমি বিপদে পড়ে যাব।

— তাহলে কথা না বাড়িয়ে কাল চলে আসুন। আসবেন তো?

— বুঝতে পারছি, আসতেই হবে। করার কিছু নেই। এবার একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

— কী কথা?

— আমি কাকে ভালবাসব, কাকে বাসব না, সে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এর মধ্যে লালবাজারের প্রবেশ কি ঠিক?

— এখন ছেলেদের অসভ্যতা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তা দেখে লালবাজার চুপ করে বসে থাকতে পারে না। আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। — বলে ভদ্রলোক ফোনের লাইন কেটে দিলেন।

।। দুই ।।

রূপা আমাকে আচ্ছা ঝামেলায় ফেলে দিয়েছে। কী কুক্ষণে যে রূপাকে ভালোবাসতে গিয়েছিলাম তা জানি না। আজ বুঝতে পারছি, ভালোবাসা কত বিপজ্জনক হতে পারে। ভালোবাসা আমাদের যে শেষপর্যন্ত হাজতে ঠেলে দিতে পারে তা জানা ছিল না। আর বলিহারি বুদ্ধি আমাদের সরকারের। শিক্ষা স্বাস্থ্য চাকরি নিয়ে সরকারের মাথাব্যাথা নেই। যত মাথাব্যথা মেয়েদের নিয়ে। কী দরকার ছিল প্রেম ও বিবাহ দপ্তর খোলার! ঠিক আছে, খুলে ভালো করেছ। কিন্তু কার ভালো? পুরুষদের নয়, মেয়েদের। কারণ আমরা পুরুষেরা নাকি সবসময় অপরাধী। মেয়েদের যেন কোনো অপরাধ নেই। তারা ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে

না। তারা যা বলবে তাই সত্য বলে ধরা হবে। আমরা পুরুষেরা যা বলব তা নাকি মিথ্যে। অথচ মানুষ জানে না মেয়েরা ইনিয়ে বিনিয়ে কত মিথ্যে কথাই না বলতে পারে। রূপার সঙ্গে মিশে তা বুঝতে পেরেছি। এর জন্য দায়ী আমরা। আমাদের কবিরা কবিতা লিখে এদের মাথায় তুলেছে। গায়কেরা এদের নিয়ে কত গানই না গেয়েছে। শিল্পীরা এদের নিয়ে কম ছবি আঁকেনি। মেয়েদের নিয়ে এদের আদিখ্যেতার শেষ নেই। থাকতো। এদের ওপর রাগ করে লাভ নেই। এখন মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার। লালবাজারে গিয়ে শোনা দরকার কে কী বলছে, কী প্রশ্ন করছে। আমাকে সব প্রশ্নের উত্তর শান্ত হয়ে দিতে হবে। কিন্তু প্রশ্নগুলো কীরকম হতে পারে? আমাকে বিব্রত করার মতো নানা প্রশ্ন হতে পারে। তবে আমি রূপার কাছে ক্ষমা চাইব না। তাতে যদি হাজতে যেতে হয়, যাব। সত্যি কি যেতে হবে? হাজতে যাওয়াটা খুব বিচ্ছিরি ব্যাপার। তাহলে কি রূপার সঙ্গে আপোশ করে নেব? দরকার হলে তাই করতে হবে। তবে এখনই কোনো সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হবে না। লালবাজারে গিয়ে যা করার করব।

আমাকে বেলা বারোটার সময় লালবাজারে হাজির হতে বলা হয়েছে। আমি অফিস কামাই করে ঠিক বারোটায় লালবাজারে গিয়ে হাজির হলাম। প্রেম ও বিবাহ দপ্তরে ঢুকে দেখি একজন মোটাসোটা অফিসার চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর সামনে বড় টেবিল। তাঁর উল্টোদিকে পাশাপাশি দুটো চেয়ার। একটা চেয়ারে রূপা বসে আছে। পাশের চেয়ারটা খালি। আমি খালি চেয়ারটায়

বসে পড়লাম।

অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি অর্ক রায়?

বললাম— হ্যাঁ।

— আপনি কি এই মহিলাকে চেনেন?

— চিনি।

— ইনি আপনার কে হন?

— কেউ না।

— কেউ না মানে?

— এর সঙ্গে আমার কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই।

— তা আমি জানি। অন্য কী সম্পর্ক আছে বলুন।

— অন্য কোনো সম্পর্ক নেই।

— তাহলে এঁকে চেনেন কীভাবে?

— মানে.... মানে... মানে...

অফিসার এবার গর্জে উঠলেন, মানে... মানে... করবেন না। আপনার সঙ্গে কি রূপাদেবীর ভালোবাসার সম্পর্ক আছে?

— ছিল একসময়। এখন আর নেই।

— অদ্ভুত কথা! রূপাদেবীকে একসময় ভালোবাসতেন। তাঁর সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন, মজা করেছেন। আর এখন ভালো লাগছে না বলে তাঁকে ছেড়ে দিয়েছেন! মেয়েদের কী ভাবেন আপনারা? মেয়েরা কি ইউজ অ্যান্ড থ্রো-র মতো জিনিস?

— আমি তা বলতে চাইনি।

— প্রকারান্তরে আপনি তাই বলেছেন। শুনুন, একটা কথা বলি আপনাকে। এই রূপাদেবীকে ভালোবাসতে হবে। রূপাদেবী ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারবেন না। যদি করেন তাহলে আপনাকে আমি শেষ করে দেব।— বলে অফিসার রূপাদেবীর দিকে তাকিয়ে বললেন,— এবার আপনার যা প্রশ্ন আছে করুন।

রূপা কঠোর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল— আমি তোমার মোবাইলে দিনের পর দিন ফোন করেছি। তোমার মোবাইল বেজে যায়। কিন্তু তুমি ধরো না। স্ক্রিনে আমার নাম দেখলেই তুমি সাড়াশব্দ করো না। কী ব্যাপার?

বিনয়ের সঙ্গে বললাম— আমি সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকি। তাই কথা বলার সময় পাই না।

রূপা ঠাট্টার সুরে বলল, — একমাস আগে তুমি আমার সঙ্গে ফুচকা খাওয়ার সময় পেতে, পার্কে বসে গল্প করার সময় পেতে, সিনেমা দেখার সময় পেতে, এখন হঠাৎ কী হল যে আমার সঙ্গে কোনো কথা বলার সময় পাচ্ছ না? নতুন কোনো মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছ নাকি?

বলে উঠলাম— ছিঃ ছিঃ! এমন কথা বোলো না। শুনতে খারাপ লাগে।

রূপার গলায় এবারেও সেই ঠাট্টা— বলল, যদি খারাপই লাগে, তাহলে মেসেজ পাঠালে উত্তর দাও না কেন? ফেসবুকে কিছু লিখলে তুমি চুপ করে থাক কেন? এমনকী বাড়ি গেলে দেখা পর্যন্ত করো না। তোমার মতলবটা কী?

আমি এবার বললাম— দ্যাখো, আমার কোনো মতলব নেই। আমি তোমাকে একসময় ভালোবাসতাম ঠিক। কিন্তু এখন আর ভালোবাসতে পারছি না।

রূপা জিজ্ঞেস করল— কেন? আমার অপরাধ?

বললাম— তোমার কোনো অপরাধ নেই। আসলে এখন আমি মেয়েদের ভয় পাই।

— কেন?

— বুঝতে পারছ না কেন? তোমাকে একসময় ভালোবেসে ছিলাম বলে আমাকে আজ অফিস কামাই করে লালবাজরে আসতে হয়েছে।

— কিন্তু আমি তোমাকে চাই। তোমার জন্যই আমাকে এসব করতে হয়েছে।

আমি এবার একটু থেমে বললাম— আমাকে তুমি ভুলে যাও। আমি তোমার জন্য আমার চেয়েও ভালো প্রেমিক জোগাড় করে দেব। কীরকম প্রেমিক তোমার চাই? বলো?

— এমন প্রেমিক চাই যার বয়স হবে তিরিশ।

— ভালো কথা।

— তার মাইনে হবে এক লাখ।

— ভালো কথা।

— তার নিজস্ব বাড়ি থাকবে।

— ভালো কথা।

— তার গাড়ি থাকবে।

— ভালো কথা।

— আমার চেয়ে লম্বা হবে।

— ভলো কথা।

— ফর্সা এবং স্বাস্থ্যবান হবে।

— ভালো কথা।

— আর তার নাম হবে অর্ক রায়।

— আরে! এতো আমি!

একথা শুনে অফিসার হেসে উঠলেন। বললেন— এটা প্রেমালাপের জায়গা নয়। আপনারা এখন বাড়ি যান।

।। তিন।।

আগে রূপাকে নিয়ে ভয় ছিল।

এখন ভয় গেছে। তার বদলে এসেছে রাগ। আমার একটাই প্রশ্ন — রূপা কেন লালবাজারে গেল? লালবাজারে না গেলে কি রূপার চলছিল না? রূপা হয়তো বলবে, লালবাজারে না গিয়ে উপায় ছিল না। তোমার দেখা পাওয়ার জন্য লালবাজার গেছি। তোমার সঙ্গে কথা বলতে লালবাজার গেছি। রূপার দিক থেকে ভাবলে কথাটা মিথ্যে নয়। তাই বলে লালবাজার যাবে? আমাকে লালবাজারে ডেকে পাঠাবে? আমার কোনো মান-সম্মান নেই? রূপার এই কাজটা আমার একদম ভালো লাগেনি। আমি যেমন চুপ করে ছিলাম, তেমনি চুপ করে থাকব। ফোন করলে ফোন ধরব, কিন্তু গল্প করব না। দু-একটা কথা বলেই ফোনের লাইন কেটে দেব।

একদিন রূপা অফিসে ফোন করল।

— রূপা জিজ্ঞেস করল— ব্যস্ত আছ?

— হ্যাঁ।

— কথা বলা যাবে না?

— না। বলে ফোনের লাইন কেটে দিলাম।

আর একদিন রাত্রিবেলা রূপা ফোন করল। রূপা জিজ্ঞেস করল— কী করছ?

— শুয়ে পড়েছি। এবার ঘুমোবো।

— কথা বলা যাবে?

— না। — বলে ফোনের লাইন কেটে দিলাম।

তারপর আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। কী হল রূপার? অসুখ-বিসুখ করেনি তো? নাকি এবার রূপা আমাকে ভুলতে চাইছে? ঠিক করেছে, আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবে না? না রাখলে তো আমি বেঁচে যাই। কিন্তু সত্যি কি বেঁচে যাই? রূপার জন্য মন কেমন করতে লাগল। আমি ভেবেছিলাম, রূপা আমাকে ফোন করবে। আমাকে তোষামোদ করবে, আর আমি অহঙ্কারী পুরুষের মতো রূপাকে উপেক্ষা করব। এককথায় আমি নিয়ত রূপাকে আঘাত করব, অপমান করব। অবহেলা করব। আর রূপা মুখ বুজে সব সহ্য করবে। এ অন্যায়, খুব

অন্যায়। লালবাজারে গিয়ে রূপা কোনো খারাপ কাজ করেনি। এটা আমার প্রাপ্য ছিল। কিন্তু এখন আর রূপার কাছে নিচু হয়ে ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। গেলে কী ভাববে রূপা? আমি রূপার কাছে ছোট হয়ে যাব। তাহলে আমি এখন...

ঠিক এইসময় একদিন একটা ফোন পেলাম।

— হ্যালো...

— আমি রূপার বাবা বলছি।

— বলুন।

— রূপা অনশনে বসেছে। খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।

— কেন?

— তোমার জন্য।

— আমার জন্য!

— হ্যাঁ। রূপা বলেছে, তুমি এসে যদি ওকে পাতিলেবুর সরবত খাওয়াও তাহলে অনশন ভাঙবে। রূপা আমার একমাত্র মেয়ে। তুমি ওকে বাঁচাও।

—ঠিক আছে, দেখছি কী করা যায়?

— দেখছি বললে চলবে না।

— তুমি এখনই চলে এস।

— এখন অফিসে আছি। সন্ধেবেলা যাব।

— তাই এস।

আমার বুকের মধ্যে কেমন করতে লাগল। সত্যি, আমি খুব খারাপ লোক। আমার জন্য রূপা খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে! এ কী কেউ করে? একেবারে বাচ্চা মেয়ে। এখন রূপার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে তার জন্য আমি দায়ী হব। ভগবান, রূপার যেন কোনো ক্ষতি না হয়। তুমি রূপাকে দেখো।

অফিসের কাজকম্ম আমার মাথায় উঠল। আমি সন্ধে হতেই রূপার বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। রূপার ঘরে ঢুকলাম। ঢুকে দেখি রূপা জানালার দিকে মুখ করে শুয়ে আছে। আর চার দেওয়ালে কাগজ সেঁটে রেখেছে। তাতে লেখা— 'অর্ক, আমি তোমাকে ভালোবাসি।' তা দেখে আমি চমকে উঠলাম। কী করব বুঝতে না পেরে রূপার পাশে গিয়ে বসলাম। রূপা জানালা থেকে মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল। চোখ দুটো খুব সুন্দর।

ঘরের মধ্যে রূপার মা-বাবা ছিলেন।

আমি রূপার মাকে বললাম,— পাতিলেবু দিয়ে এক গ্লাস সরবত করে আনুন। বেশি চিনি দেবেন না।

রূপার মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি এবার রূপাকে বললাম— আমি এসেছি। এবার উঠে বসো।

রূপা উঠে বসল।

Phone : 2573 0416
2572 4419

BIKANERVALA

10181-82, Chowk Gurdwara Road
Karolbagh
NEW DELHI-110005

Our Speciality

PISTA LAUJ & BADAM KATLI,
BENGALI SWEETS & NAMKEENS

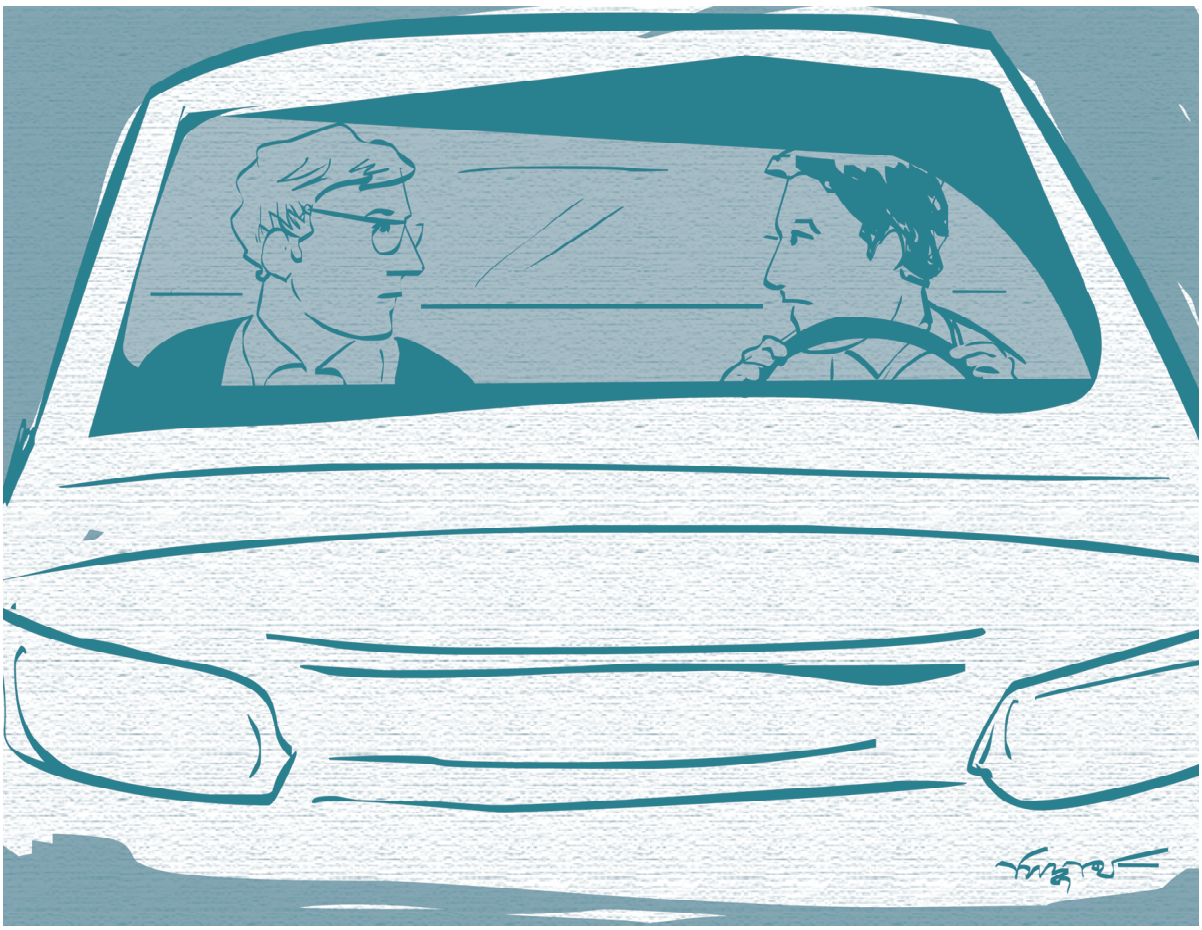

অন্তরালে

শেখর বসু

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে আবার ওই ভদ্রমহিলার গল্প জুড়ে দিয়েছিল অনির্বাণ। 'ভদ্রমহিলার নাম পেনি পোর্টার। আমেরিকান। দু-বছর হল চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। এখানে চাকরি থেকে রিটায়ার করার বয়স পঁয়ষট্টি। তার মানে উনি এখন সাতষট্টি। কিন্তু দেখলে পঞ্চাশ-পঞ্চান্নর বেশি মনে হবে না। খুব লম্বা। কিছু সোশ্যাল সার্ভিস করে থাকেন, রোববার রোববার গির্জায় যান। হাসিখুশি মানুষ, নিজের মতো করে দিন কাটান।'

'ওঁর স্বামী মারা গেছেন কবে?'

'বছর দশ-বারো হবে। শুনেছি খুব সুখী দম্পতি ছিলেন ওঁরা।'

‘ভদ্রলোক কীভাবে মারা গেলেন?’

‘হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে।’

‘ওদের ছেলেমেয়ে..’

‘একটিমাত্র মেয়ে। থাকে দক্ষিণ আফ্রিকায়। দু-তিন বছর পর পর একবার এসে মাকে দেখে যায়।’

‘কাছাকাছি থাকলে মাকে নিজের কাছে এনে রাখতে পারত।’

অনির্বাণ হেসে উঠেছিল। ‘এখানে ওই ব্যাপারটাই নেই। সব যে যার মতো থাকে। স্বামী-স্ত্রীর একজন মারা গেলে বাকিজন একেবারেই একা। এ দেশটা আত্মনির্ভরতার দেশ। একেবারে ছোটবেলা থেকেই আত্মনির্ভরতার পাঠ শুরু হয়ে যায়। বাচ্চাদের জন্য আলাদা আলাদা ঘর। চার-পাঁচ বছর বয়স থেকেই নানা ব্যাপারে তাদের মতামত নেওয়া হয়। মা হয়তো বাচ্চাকে আইসক্রিম খাওয়াতে নিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করবে— কী খাবে তুমি? স্ট্রবেরি? না ভ্যানিলা? এইরকম। কোন জামা পরবে? কোন জুতো পরবে? একটু বড় হতে শুরু করলেই নিজেদের ঘরে বসে নিজেদের পছন্দমতো টিভি প্রোগ্রাম দেখে। ডিভিডি-তে নিজের পছন্দমতো কার্টুন বা অ্যাডভেঞ্চার ফিল্ম দেখে। এই করে আঠারোয় পৌঁছলেই সাবালক। তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজের মতো করে থাকে। চাকরি-বাকরি করে। কখনও কখনও হায়ার স্টাডিজে যায়। যখন টিনএজার তখন থেকেই পার্টটাইম রোজগার শুরু করে দেয়। ফাস্টফুড সেন্টারে কাউন্টার সামলায়, হোটেলে ডিসওয়াশিং, শপিংমলে প্যাকিং— এইসব। পকেটমানি থেকে ছোটখাটো শখসাধ মেটায়। এদের সংসারটা পাখির সংসারের মতো। ছানা বড় না হওয়া পর্যন্ত বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকে। বড় হলেই উড়ে যায়। আত্মনির্ভরতার সঙ্গে এদের মানসম্মান জড়িয়ে থাকে অনেকখানি। বয়স আঠারো পেরুলেই তুমি তোমার মতো। বুড়ো হয়ে মরতে বসলে নার্সিংহোমে যাবে, কিন্তু কিছুতেই ছেলেমেয়ের সংসারে থাকবে না। থাকা মানেই গলগ্রহ হওয়া। সেইরকমই ভাবে এরা। কেউ সেটা চায় না।’

একুশ বছরের আমেরিকাবাসী অনির্বাণ। তিন মাসের জন্য এদেশে বেড়াতে আসা বন্ধুকে মার্কিনি সমাজ সংসারের সার কথাটা সুযোগ পেলেই বোঝাবার চেষ্টা করে। দ্রুত চোখে হাতঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে সুমন্ত বলল, ‘আচ্ছা, পেন্টিং সংগ্রহ করাটা কি পেনি পোর্টারের বরাবরের ঝোঁক?’

‘না-না, ঝোঁকটা ছিল ওঁর স্বামীর। দেশ বিদেশ ঘুরে ঘুরে ছবি সংগ্রহ করতেন। ব্যবসার জন্য নয় কিন্তু। স্রেফ শখ। বিভিন্ন আর্ট গ্যালারিতে নিয়মিত যেতেন ছবি দেখার জন্য। সঙ্গে পেনিও যেতেন। ছবিপাগল স্বামীর সঙ্গে ঘুরে ঘুরেই বোধহয় ওঁরও ছবির নেশা ধরে গিয়ছিল।’

‘আচ্ছা, তুই যে বলেছিলি ওঁদের কালেকশনে পিকাসো আর সালভাদর দালির দুটো ওরিজিনাল পেন্টিং আছে, সত্যি?’

‘সত্যি বলেই তো তোকে নিয়ে যাচ্ছি। তুই ছবির রসিক। এদিক-ওদিক দেখে বেড়াস। আমি তো পেনিকে বলেছি— আমার এই বাল্যবন্ধুটি ছবির মস্ত বড় এক বোদ্ধা।’

অস্বস্তি তীব্র হয়ে উঠেছিল সুমন্তের মধ্যে। ‘ছি-ছি। এসব আজেবাজে কথা বলতে গেলি কেন?’

‘তুই তো বহুদিন ধরেই আর্ট গ্যালারিতে ঘুরিস। ছবি নিয়ে লেখা বইপত্তর পড়িস। ভুল বললাম কোথায়?’

‘আরে, আমার মতো এলেবেলে সমঝদার তো সবাই।’

‘কই আমি তো আধুনিক ছবির মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি না।’

সুমন্তর অস্বস্তি আরও খানিকটা বেড়ে গিয়েছিল। ভদ্রমহিলাকে বলে ফেলা ওই কথাগুলো ফিরিয়ে নেওয়ার আর কোনো উপায় নেই। বিদেশ বিভুঁইয়ে এসে একজন সত্যিকারের বড় আর্ট কালেক্টরের সামনে বসে ছবির নকল বোদ্ধা সাজার বিড়ম্বনা তো কম নয়!

এখানকার রাস্তা চওড়া আর মসৃণ। দ্রুতগতিতে আরও কিছু কিছু গাড়ি ছুটছিল, কিন্তু জ্যাম কাকে বলে তার চিহ্ন ছিল না কোথাও। মিনিট কুড়ি-পঁচিশের মধ্যেই ওরা পেনি পোর্টারের অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল।

পার্কিং এরিয়ায় গাড়ি পার্ক করল অনির্বাণ। সামনে ইট রঙের মস্ত একটা বাহারি বাড়ি। বাড়ির সামনে চমৎকার একটুকরো বাগান। ওদিকে ঝুপসি গাছের লম্বা দুটো সারি। আশপাশে কিংবা রাস্তার সাইডওয়াকে একজনও লোক নেই। এই মহাদেশে জমির তুলনায় লোকসংখ্যা নামমাত্র। যে কোনো জায়গায় গেলেই সেটা কমবেশি বোঝা যায়।

দরজায় বেল টেপার একটু পরেই করিডরে দ্রুত পা ফেলার শব্দ শোনা গেল। দরজা খুললেন পেনি

পোর্টারই। হাসি মুখে বললেন, 'কাম ইন প্লিজ, আই ওয়াজ ওয়েটিং ফর ইউ।'

অনির্বাণ বলল, 'পেনি তোমাকে তো টেলিফোনেই বলেছি, অফিসে আমার একটু কাজ পড়ে গেছে। কাজটা শেষ করেই আমি ফিরে আসব। মিনহোয়াইল তোমরা গল্প করো। হিয়ার'জ মাই ফ্রেন্ড সুমন্ত— এ গ্রেট লাভার অফ পেন্টিংস।'

পেনি পোর্টার আর একদফা হেসে স্বাগত জানাল অতিথিকে। অনির্বাণ হাত নেড়ে বিদায় নিয়েছিল।

পেনি পোর্টার লম্বায় প্রায় ছ-ফুট। পাতলা চেহারা, সেই জন্যই বুঝি সামনের দিকে একটুখানি ঝুঁকে গেছেন। গায়ের রঙ অসম্ভব ফর্সা বলেই হাতের ফুটে-ওঠা শিরাগুলো একটু বেশি মাত্রায় নীল।

মার্কিন মুলুকের কেতা-সহবত বোঝাতে গিয়ে অনির্বাণ আগেই বাল্যবন্ধুকে বলেছিল, মার্কিনিরা খুব ইনফর্মাল, এখানে নাম ধরে ডাকার চল, বয়স যতই হোক না কেন। পুঁচকে পুঁচকে ছাত্রছাত্রীরা বাপের বয়সী মাস্টারমশাইদের নাম ধরে ডাকে। কিন্তু এই শিক্ষাটা নিতে পারেনি সুমন্ত। ওর সংস্কারে আটকাচ্ছিল। এখনও পর্যন্ত যেটুকু কথাবার্তা হয়েছে, পেনি না বলে ও মিসেস পোর্টার বলেই সম্বোধন করেছিল।

দোতলায় লম্বা করিডর। একদম ধারের অ্যাপার্টমেন্টটা পেনি পোর্টারের। অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকেই অবাক হয়ে গিয়েছিল সুমন্ত। এ তো ছোটখাটো একটা আর্ট গ্যালারি!

বসার ঘরটা বেশ বড়। নানা ধরনের ছবি সাজানা আছে দেওয়ালে। বিস্ময় প্রকাশ করে সুমন্ত বলল, 'আপনার তো ছবির দারুণ কালেকশন!'

পেনির মুখে সলজ্জ একটা আভা ফুটে উঠেছিল। মৃদু প্রতিবাদের গলায় বললেন, 'না-না, এসব ছবি একটাও আমার সংগ্রহ নয়। আমার স্বামীর। খুব ছবি ভালোবাসতেন। বছর দশেক হল উনি মারা গেছেন।'

সুমন্তের চোখমুখে সমবেদনার ভাব আপনা-আপনিই ফুটে উঠেছিল। মৃদু গলায় বলল, 'আপনার স্বামী মৃত্যুসংবাদ শুনে খুব খারাপ লাগছে। কী হয়েছিল ওঁর?'

'কিচ্ছু না। বেশ সুস্থসবল মানুষ ছিলেন। হঠাৎ একটা ম্যাসিভ হার্ট-অ্যাটাক। সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু। আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের কাছেই হাসপাতাল। ফোন করতেই অ্যাম্বুলেন্স এসে গিয়েছিল। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তক্ষুনি। দেয়ার হি ওয়াজ ডিক্লেয়ার্ড ডেড। ব্যাপারটা আমার কাছে ভীষণ অবিশ্বাস্য ঠেকেছিল। আমি কিছুতেই সেটা মেনে নিতে পারিনি। তারপর অনেকদিন ডিপ্রেশনে ভুগছিলাম। থ্যাঙ্ক গড! আমি ওই অবসাদ শেষপর্যন্ত কাটিয়ে উঠতে পেরেছি।'

এসব কথার জবাবে কী বলা উচিত বুঝতে পারছিল না সুমন্ত।

পেনি প্রসঙ্গ পাল্টে আগের সেই ঝরঝরে গলায় বললেন, 'চলুন, বাকি ঘরদুটোরও ছবি দেখবেন। ওখানেও অনেক ছবি আছে। আই লাভ আর্ট-লাভার্স।'

সুমন্তের বলতে ইচ্ছে করছিল— আমি ছবির বোদ্ধাটোদ্ধা নই। দেখতে ভালো লাগে, ব্যাস। ওই পর্যন্তই। কিন্তু মুখের কথাগুলো ওর মুখের মধ্যেই থেকে গিয়েছিল। বলল, 'চলুন।'

বাকি দুটি ঘরের দেওয়ালও ছোট-বড় নানান ছবিতে ভর্তি। কিন্তু এ তো আর আর্ট-গ্যালারি নয়, বসবাস করার অ্যাপার্টমেন্ট। ঘরগেরস্থালির সব কিছুই আছে এখানে। একধারে শোবার সিংগল খাট, অন্যদিকে চেয়ারটেবিল। এক কোনায় ঝুলছে কয়েকটা বাহারি টুপি, সরু করে পাকানো ছাতা। আয়না, ড্রেসিং টেবিল, টেবিলে সাজানো কিছু প্রসাধন দ্রব্য। দেওয়া-ঘেঁষা টুলের ওপর কিছু ওষুধপত্রের শিশি। একা মানুষের সংসার যেমন হয়। ব্যতিক্রম শুধু ঘরের দেওয়ালগুলো। সযত্নে ঝোলানো আছে ছোট-বড় কিছু পেন্টিং, স্কেচ।

সুমন্ত অনুরাগী দর্শকের মতো কিছু কিছু ছবি বেশ খুঁটিয়ে দেখছিল। তারিফও করছিল মাঝেমধ্যে। পেনি ছবি সংগ্রহের বিভিন্ন গল্পও শোনাচ্ছিলেন। ছবি কিনেছেন কখনো নিলাম থেকে, কখনও কারও বক্তিগত সংগ্রহ থেকে। কখনও পেন্টারের বাড়ি থেকে। ছবি-পাগল স্বামীর কথাও চলে আসছিল প্রায় প্রতিটি কথায়।

ভেতরের দুটো ঘরের ছবি দেখার পরে ওরা আবার ফিরে এসেছিল বসার ঘরে। এ-ঘরের ছবির সংখ্যাই বেশি। ছোট ছোট টুলে কিছু শিল্পদ্রব্যও সাজানো ছিল। সব কিছুর ওপর চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে সুমন্ত জিজ্ঞেস করল, 'অনির্বাণ বলছিল আপনার কালেকশনে পিকাসো আর সালভাদর দালির দুটো ওরিজিন্যাল পেন্টিং আছে।'

'ওই তো ওই কর্নারে। আসুন না।'

পেনির পিছু পিছু লম্বাটে বসার ঘরের ধারের দিকে চলে এসেছিল সুমন্ত। আঙুল তুললেন ভদ্রমহিলা— ‘ওই তো পিকাসো আর দালি পাশাপাশি।’

ছবির কাছে পৌঁছে গিয়েছিল সুমন্ত। খুঁটিয়ে ছবিদুটো দেখার পরে একটু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল ও। ‘অপূর্ব! পিকাসোর ওরিজিন্যাল কোনো ছবি দেখা মানেই আশ্চর্য এক অভিজ্ঞতা। মাস্টার-পেন্টার। দালির ছবিটাও অসামান্য। স্যুররিয়েলিস্ট পেন্টারদের মধ্যে দালির কাজই আমার সবচাইতে ভালো লাগে।’

বেশ কিছুক্ষণ ধরে একনাগাড়ে ছবিদুটোর প্রশংসা করে গিয়েছিল সুমন্ত। ও থামলে পেনি বললেন, ‘এবার আসুন। কফি খাবেন তো একটু?’

সুমন্ত বলতে যাচ্ছিল— কেন আবার কষ্টা করে করবেন! কিন্তু এই কথাটা মার্কিনি সহবতের মধ্যে পড়ে কি না বুঝতে না পেরে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বলল, ‘হ্যাঁ, খেতে পারি। কিন্তু আপনি খাবেন তো?’

ঝলমলে মুখে পেনি বলে উঠলেন, ‘খাব, আমি এইসময় এক কাপ কফি খেয়ে থাকি।’

শীর্ণ চেহারার পেনি লম্বা লম্বা পা ফেলে একদম কোণের ঘরটায় চলে গিয়েছিলেন। ওটাই পেনির রান্নাঘর।

বসার ঘরে বসার জায়গা এখানেই। ইংরেজি ‘এল’ হরফের মতো লম্বা একটা সোফা। সামনে টেবিল। এই সোফায় বসে বেশ ভালোভাবে পিকাসো আর দালির দেখা যায়। পাশে বড় একটা কাঁচের জানালা। জানালার ব্লাইন্ডস ফেলা।

ওপাশে ছোট একটা তেপায়া টেবিলের ওপর এক মহিলার ফোটোগ্রাফ। তার কোলে বছর চারেকের একটা ছেলে। এই মহিলাই মনে হয় পেনির আফ্রিকানিবাসী মেয়ে। কোলে নির্ঘাত ওরই ছেলে, পেনির নাতি। ঘরভর্তি এত পেন্টিং আর স্কেচের মধ্যে ছোট্ট এই ফোটোগ্রাফটা বুঝি অন্য মাত্রা এনে দিয়েছিল।

সুমন্ত আবার পিকাসো আর দালির ছবির দিকে চোখ ফিরিয়েছিল। এই দুই বিখ্যাত চিত্রকর সম্বন্ধে ও যতটুকু যা জানে— ওর মাথার মধ্যে তা জড়ো হতে শুরু করেছিল। কিছু কিছু তো বলা যেতে পারে।

একটু বাদেই ফিরে এসেছিলেন পেনি। ওঁর হাতের ট্রেতে কফি-পট, পাশের দুটো ছোট্ট পাত্রে চিনি আর দুধ। আর একটা প্লেটে কিছু বিস্কুট। মৃদু হাসি মুখে ফুটিয়ে উনি বললেন, ‘আমি কালো কফি খাই। আপনি?’

‘আমিও কালো।’

‘চিনি কতটা দেব?’

‘এক চামচ।’

চটপট কফি বানিয়ে ফেলেছিলেন পেনি। কফির কাপ হাতে নিয়ে পেনি বসলেন সোফার অন্য প্রান্তে।

কফিতে চুমুক দিয়ে সুমন্ত বলল, ‘বাহ্! কফিটা তো দারুণ।’

খুশি হলেন পেনি। ‘এই কফিটা আমার মেয়ে নিয়ে এসেছিল। ও থাকে অনেক দূরে— এ লং ওয়ে অফ দক্ষিণ আফ্রিকা।’

‘ওই ফোটোগ্রাফটা কি আপনার মেয়ের?’

‘ইউ আর রাইট! আর ওর কোলের ছেলেটা আমার নাতি— ভেরি নটি বয়।’

উদ্ভাসিত গ্রান্ড-মা দুষ্টু নাতির দুষ্টুমির গল্প শোনালেন। একটু বাদে গল্প আবার ফিরে এসেছিল ছবির জগতে। সুমন্ত জিজ্ঞেস করল, ‘আচ্ছা, পিকাসো আর দালির পেন্টিং দুটো আপনারা কীভাবে সংগ্রহ করলেন?’

ঝলমলে হয়ে উঠেছিল পেনির চোখমুখ। ‘সে এক গল্প! আমার স্বামীর সারা জীবনের একমাত্র শখ ছিল ছবি দেখা। আর সাধ্য কুলোলে কিছু কিছু ছবি সংগ্রহ করা। অনেক বছর আগে একদিন এক গ্যারাজ-সেলে হাজির হয়ে দেখল ঘরের নানান ছবির সঙ্গে ল্যান্ডলেডি এই দুটো ছবিও বিক্রি করে দিচ্ছেন। আমার স্বামী ভেবেছিলেন পেন্টিংয়ের কপি। দাম সামান্যই। ছবিদুটো ও সঙ্গে সঙ্গে কিনে নিয়েছিল। কিন্তু বাড়ি ফিরে আসার পরে ছবিদুটো দেখে বারবার খট্‌কা লাগছিল। কপি এত নিখুঁত হয় কী করে! কিছুদিন বাদে ছুটেছিল ছবির মস্ত একজন এক্সপার্টের কাছে। তিনি নানাভাবে ছবিদুটো পরীক্ষা করার পরে রায় দিলেন— ও দুটো ওরিজিন্যাল ছবি। সেদিন ওর চোখমুখের যা অবস্থা হয়েছিল না কী বলব! অত খুশি বোধহয় বাচ্চারাও হতে পারে না। তারপর থেকে ছুটিছাটা পেলে, এমনকী রাত জেগেও ছবিদুটোর সামনে ও চুপ করে বসে থাকত। ছবি দেখে অত খুশি হতে আমি আর কাউকে দেখিনি। কয়েকদিন পরে ওই এক্সপার্টের কাছ থেকে খবর পেয়ে বিরাট এক আর্ট কালেক্টর আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে এসে হাজির। ছবিদুটো কেনার জন্য অনেক মিলিয়ন ডলার অফার করেছিল। আনবিলিভেবল

অ্যামাউন্ট! কিন্তু আমার স্বামী ওকে ভাগিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, আপনি যত বড় ট্রেজারই আমাকে অফার করুন না কেন, এ ছবি আমি কখনোই বিক্রি করব না।'

অমূল্য ছবিদুটো সংগ্রহ করার গল্প শুনে সুমন্ত তো থ। 'এ তো অবিশ্বাস্য কাহিনি শোনালেন আপনি! ওই আর্ট কালেক্টর চলে যাওয়ার পরে আর কেউ কিনতে আসেনি?'

'এসেছিল। এক এক করে অনেকেই। টাকার অঙ্কও লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছিল। কিন্তু আমার স্বামী কখনও রাজি হননি। ও মারা যাওয়ার পরেও কয়েকজন ছবি কেনার জন্য এসেছিল। আমিও রাজি হইনি। এই তো মাসপাঁচেক আগেও একজন এসেছিল। বিশাল টাকার অফার। আমি ওকে অ্যাপার্টমেন্টের দরজা দেখিয়ে দিয়েছিলাম।'

সুমন্তর বিস্ময়বোধ থিতিয়ে পড়ার সময় পাচ্ছিল না। কোনোমতে বলে ফেলল, 'আসলে আপনি ছবি খুব ভালোবাসেন তো। ছবির যারা সত্যিকারের বোদ্ধা, এমন ছবি তারা কিছুতেই হাতছাড়া করতে চান না। প্রলোভন যত বড়ই হোক না কেন।'

পেনি এবার সুমন্তকে ভীষণভাবে চমকে দিয়ে বলে উঠলেন, 'আমি ছবির কিচ্ছু বুঝি না।'

এ কথার জবাবে কোনো কথা খুঁজে পেল না সুমন্ত।

একটু পরে পেনি হাসতে হাসতে বললেন, 'আপনার মতো ছবির রসিকরা মাঝেমাঝেই এখানে ছবি দেখতে আসেন। আমি সবাইকে ওয়েলকাম করি। ছবি ওদের ভালো লাগলে আমি খুব খুশি হই। কিন্তু আপনাকে সত্যি কথাই বলছি— আমি

ছবির কিচ্ছু বুঝি না। আমার স্বামীর সঙ্গে বহু আর্ট-গ্যালারিতে ঘুরেছি। আসলে ছবি দেখতে ওর এত ভালো লাগত বলেই সঙ্গে যাওয়া। মনে হতো সঙ্গে না গেলে ও কষ্ট পাবে। আমি ছবির কিচ্ছু বুঝি না, ভালো লাগাবার চেষ্টা করেও পারিনি— এই কথাটা গোপন করে যেতাম ওর সঙ্গে। সত্যি কথাটা শুনতে ওর খারাপ লাগবে বলেই ওই গোপনতা। আর্ট-গ্যালারিতে অত ঘোরাঘুরি করেও ছবি দেখার চোখ তৈরি হয়নি আমার। এসব কথা আজ পর্যন্ত কাউকে বলিনি আমি। আজ ঝোঁকের মাথায় বলে ফেললাম আপনাকে।'

সুমন্তের কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অনেক সময় কিছু কথা মুখের মধ্যে আসে, কিন্তু বাইরে বার হয় না। এবার তেমন কিছু নয়, ওর মাথাটাই কেমন যেন শূন্য হয়ে গিয়েছিল।

পেনিকে বোধহয় কথা বলায় পেয়েছিল। বললেন, 'পিকাসো আর দালির ছবি দেখে এক্সপার্টরা কত কথা বলে যান। কিউবিজম, ব্লু পিরিয়ড, স্যুররিয়েলিজম— কত কথা। কিন্তু কথাগুলো আমি বুঝে উঠতে পারি না। যদি আমার ছবি দেখার চোখ তৈরি হত একটু আধটু, তাহলে ওই সব কথা নিশ্চয়ই ছবি অ্যাপ্রিসিয়েট করার ব্যাপারে আমাকে অনেকখানি সাহায্য করত। কিন্তু আমি ছবিই যে বুঝি না। এক্কেবারে না।'

সুমন্ত ওর অসাড় অবস্থা খানিকটা কাটিয়ে নিয়ে বলল, 'আপনি এই ছবিগুলো দেখেন না?'

'দেখি তো। রোজই দেখি। আপনি যেখানে বসে আছেন, ওখানে বসে অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা পিকাসো আর দালির ছবির দিকে তাকিয়ে থাকি।'

পেনির ইংরেজি বেশ পরিচ্ছন্ন, কথার মধ্যে ইয়াংকি টান একটু কমই আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে ওর কথাগুলো সুমন্তের কাছে কেমন যেন দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছিল।

একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে ও বলল, 'ছবি যদি আপনার ভালোই না লাগে, আপনি ছবির সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকেন কেন?'

প্রশ্ন শুনে পেনি বোধহয় বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বললেন, 'আপনাকে তা হলে আর একটা সত্যি কথাও বলি। এই কথাটাও আমি আজ

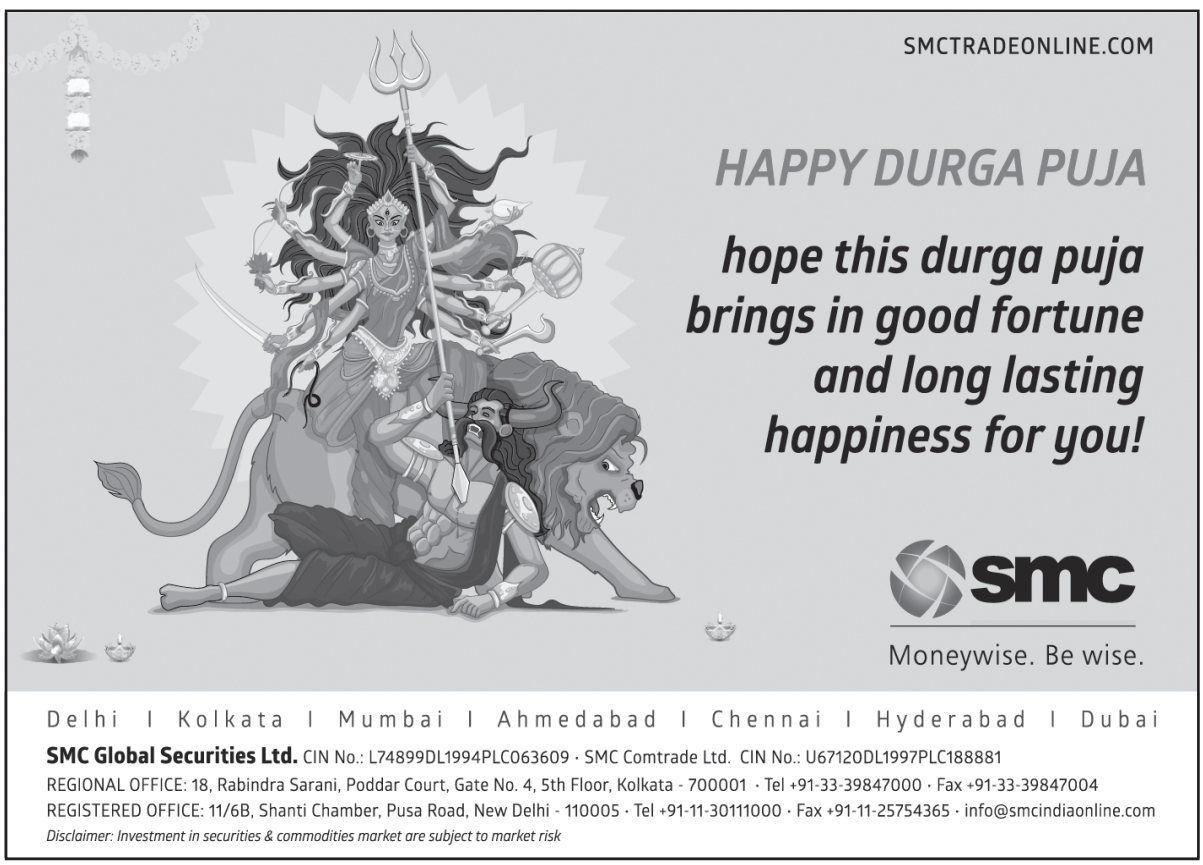

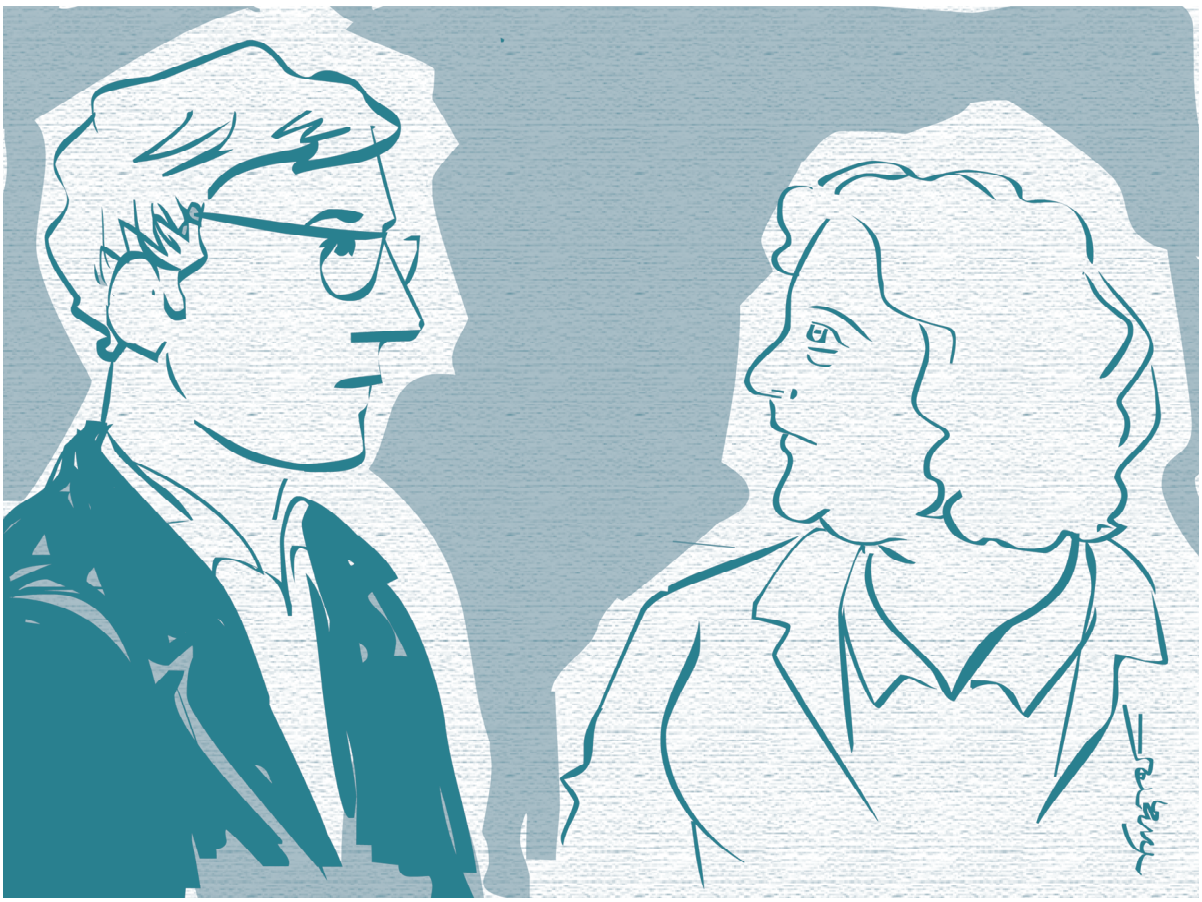

পর্যন্ত কাউকে বলিনি। আমার স্বামীর নাম টিম। আমি পিকাসো আর দালির ছবির দিকে তাকিয়ে থাকলে টিমকে দেখতে পাই। সেই যে যেদিন ও জানতে পেরেছিল— পিকাসো আর দালির এই ছবিদুটো ওরিজিন্যাল— সেদিন ও ঠিক ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে উঠেছিল। ওর অমন খুশি খুশি মুখ আমি আর কখনো দেখিনি। টিমের ওই মুখটা আমি ওই ছবিদুটোর দিকে তাকালে দেখতে পাই।'

পেনি বোধহয় একটু আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছিলেন। নিজেকে সামলানোর জন্যই উনি বুঝি 'এক্সকিউজ মি' বলে ট্রের ওপর শূন্য কফির কাপ তুলে দ্রুত পায়ে রান্নাঘরে চলে গেলেন।

ফিরলেন কিছুক্ষণ পরে। ঠিক তার পরেই অনির্বাণের ফোন এলো— ও আসছে।

ফোন করার কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে গিয়েছিল অনির্বাণ। এসেই হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'আই অ্যাম ভেরি সরি পেনি। ইটস এইট ফিফটিন— ইওর ডিনার টাইম। পরে আবার একদিন ফোন করে চলে আসব। আজ চলি। গুড নাইট।'

পেনি দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'গুড নাইট।'

সুমন্তও হাত নেড়ে শুভ রাত্রি জানিয়েছিল।

নির্জন রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা এখন আরও কমে গিয়েছে। অনির্বাণের গাড়ি দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছিল রাস্তায়। সামনের বাঁকটা নেওয়ার পরে অনির্বাণ জিজ্ঞেস করল, 'কেমন কাটল তোর পেনির সঙ্গে?'

'ভালো, খুব ভালো।'

'ভালো তো কাটবেই, দুজনেই ছবির রসিক।'

সুমন্তের মুখে কিছু কথা এসে গিয়েছিল, কিন্তু কথাগুলো ও জোর করে ঠেলে দিয়েছিল পেছন দিকে। পেনির ওই গোপন কথাগুলো গোপনই থাক।

অনির্বাণ ওর অফিসের গল্প জুড়ে দিয়েছিল। কিন্তু কথাগুলো সুমন্তের কানের ওপর আছড়ে পড়লেও ভেতরে ঢুকতে পারছিল না। পেনির স্বামী টিমকে সুমন্ত কখনো দেখেনি। মানুষটির চেহারার কোনো বর্ণনা দেয়নি পেনি। কিন্তু থেকে থেকেই ওর মধ্যে কেমন যেন একটা বিভ্রম তৈরি হচ্ছিল। পিকাসো আর দালির ছবিদুটোর মধ্যে মাঝবয়সী একটি মানুষকে ও দেখতে পাচ্ছিল বারবার।

ARYA TOURIST LODGE

Just 5 Minute walk from N.D. Rly. Station

Only 1 km. from Connaught Place

Homely Atmosphare

Day & Night Taxi Facilities

8526, Ara Kashan Road

Ram Nagar, New Delhi - 110055

Phones : 23622767, 23623398, 23618232

STD : 23530775, 23533398,23618232 **Cont : 9811044543**

E-mail : arya_tourist_lodge@yahoo.co.in **Fax : 91-11-23636380**

A
Since 1948

Ahuja

Tailors & Drapers (Regd.)

5/54, Ajmal Khan Road, Karol Bagh,

New Delhi-110 005

☎ Shop : 25764007, 41450181,

Fax : 25738096

e-mail : tailorindia@gmail.com

With the best Compliments from :

Damiyaas

Enterprises

(Banwari Lal Associates (P) Ltd.

WHOLE SALE & RETAIL OF GOLD JEWELLERY

Gems & Diamond Jewellery
1, Ambedkar Road,
Ghaziabad-201 001 (U.P.)
Phone : 0120-4120728
Mobile : 9871835848

ভগিনী নিবেদিতা ও সরলাদেবী চৌধুরানি
জাতীয় জাগরণে নারীশক্তির স্ফুলিঙ্গ

প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

কেমন ছিল বিশ শতকের প্রথম দশকে বাংলা তথা ভারতের জাতীয় জীবন? বোধকরি এক সংগ্রামী চেতনায় উদ্‌ভাসিত হয়েছিল বাংলা ও মহারাষ্ট্র। বাংলায় স্বামী বিবেকানন্দ জাগরণের মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। মুক্তিসাধনাকে জাতীয় ধর্ম বলে চিহ্নিত করেছিলেন। মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ফলিত বেদান্তের রূপকার। অনুরূপভাবে মহারাষ্ট্রে লোকমান্য তিলক বেদান্ত ভাবনা থেকেই স্বাধীনতাকে মানুষের দিব্য চেতনার প্রতিবিম্ব বলে মনে করতেন। তফাত একটাই, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বাণী ও রচনার মাধ্যমে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, আর তিলক সক্রিয়ভাবে গণরাজনীতির পথে অগ্রসর হয়েছিলেন।

জাতীয় মুক্তিসাধনার মহামন্ত্র যে আবেগ সৃষ্টি করেছিল, তারই সার্থক প্রতিফলন মেলে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারতমাতা' চিত্রে আর ঠাকুরবাড়ির সরলা ঘোষালের 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতায়। সংগ্রামের অভয়মন্ত্র ধ্বনিত হয়েছিল তাঁর কলমে। তিনি লিখেছিলেন—

''অভয়ার ডঙ্কা বাজেরে
বাজে রণমাঝে
রক্ত তপ্ত কর হুঙ্কারে শঙ্খ
নিনাদে জয়নাদে।''

আমার লেখায় সেই সময়ের দুই বরেণ্য নারীর অসাধারণ ভূমিকা তুলে ধরতে চাই। চিন্তা ও কর্মে দুজনেই ছিলেন ভারত-আত্মার সার্থক প্রতিনিধি। একজন হলেন ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬৭-১৯১১ খৃঃ) আর অন্যজন হলেন সরলা দেবী চৌধুরানি (১৮৭২-১৯৪৫ খৃঃ)। তাঁরা দুজনেই স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। লোকমাতা নিবেদিতা ছিলেন স্বামীজীর শিষ্যা। আইরিশ দুহিতা হয়েও ভারতকে ধ্যান জ্ঞান ও কর্মক্ষেত্রে পরিণত করেছিলেন। স্বামীজীর ভারত-প্রীতি

ভগিনী নিবেদিতা

তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। স্বামীজী বলতেন যে তিনি ভারতবর্ষের ঘনীভূত রূপ। আর নিবেদিতার মধ্যেও সেই উপলব্ধি ফুটে উঠেছিল। নিবেদিতা তাঁর গুরু সম্পর্কে বলেছেন— 'ভারতবর্ষ ছিল স্বামীজীর গভীরতর আবেগের

কেন্দ্র... ভারতবর্ষ নিত্য স্পন্দিত হতো তাঁর বুকের মধ্যে, প্রতিধ্বনিত হতো তাঁর ধমনীতে, ভারতবর্ষ ছিল তাঁর দিবাস্বপ্ন, ভারতবর্ষ ছিল তাঁর নিশিথের দুঃস্বপ্ন। শুধু তাই নয়, তিনি হয়ে উঠেছিলেন ভারতবর্ষ— রক্তমাংসে গড়া ভারত প্রতিমা।"

ভারত-প্রীতি। সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল বিবেকানন্দের ক্ষাত্রমন্ত্র ও জ্বালাময়ী বাণী। তাঁর ভাষায়, ''আমি চাই এমন লোক যাদের পেশী লোহার মতো দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত দিয়ে তৈরি আর চাই সেই মন যা বজ্রের উপাদানে গঠিত।" সরলা দেবী চৌধুরানিকে বিবেকানন্দের ক্ষাত্রমন্ত্র ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন, ''যার ভেতরে বারুদের ধর্ম আছে, প্রচণ্ড তেজ, প্রচণ্ড ভাঙাগড়ার শক্তি, সেই বারুদের আগুন থেকে একটা স্ফুলিঙ্গ আমার দিকে এসে পড়েছিল।"

এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনায় দুটি জিনিস বেরিয়ে এল, একটি হলো ভারতপ্রীতি। ভারতের মাটি, তার মানুষ, সমাজ, সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ। অথচ ভারত সেসময় ঔপনিবেশিক শাসন, দেশীয় লোকাচার, ভেদভাব— এসব ব্যাধিতে আক্রান্ত। তাই চাই অনমনীয় সংগ্রাম। অনবদ্য ভঙ্গিতে নিবেদিতা ভারতবাসীকে আহ্বান জানালেন, ''ঘুমিয়ে থাকা কি আর সম্ভব? ওঠো। জাগো। লড়াইয়ের ডাক এসেছে।" স্বাভাবিকভাবেই নিবেদিতা বজ্রকে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর প্রতীক হিসাবে।

জন্মসূত্রে আইরিশ মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে তিনি ভারতে আসেন ১৮৯৮ সালের ২৮ জানুয়ারি। প্রথমে তিনি নিজেকে পরিপূর্ণভাবে নিবেদন করলেন ভারতবাসীর কল্যাণে। শিক্ষা ও সেবাব্রত এই দুই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কলকাতায় প্লেগ মহামারীর সময় আর্তজনের সেবায়ও ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এরপর শুরু হলো ভারত অনুসন্ধানের পর্ব। একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে ফিরে ভারত আবিষ্কার করলেন। হিন্দুধর্মের শাশ্বতবাণী তাঁকে উদ্বেলিত করল। ঐতিহ্যের সমীকরণে ভারতে শিল্পচর্চার আন্দোলনে নিজেকে সঁপে দিলেন।

কিন্তু শুরু হলো ঝড়ের মাতন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বাংলার মরা গাঙে বান ডেকে আনল। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের তিনি ছিলেন প্রেরণাস্থল। শ্রীঅরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। কিন্তু জাতীয় সংগ্রামে নিবেদিতার সঠিক কী ভূমিকা ছিল সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

গিরিজা শঙ্কর রায়চৌধুরী প্রমুখ বাংলায় বিপ্লববাদের আগমনে নিবেদিতার ভূমিকা অতিরঞ্জিত ভাবে দেখিয়েছেন। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ডন সোসাইটিতে নাকি নিবেদিতা বিপ্লববাদের কথা প্রথম প্রচার করেছিলেন। একথা অতিরঞ্জিত বলেই মনে হয়। আবার নিবেদিতা নাকি যুগান্তর পত্রিকা স্থাপনেও মূল ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এরও কোনো প্রামাণ্য তথ্য নেই। স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ও নিবেদিতার স্নেহভাজন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মনে করেন যে, ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে বাজারে অনেক অপ্রাকৃত প্রচার চালানো হয়েছে। তিনি নাকি আইরিশ গুপ্ত সমিতির সদস্যা ছিলেন আর ভারতে গুপ্ত সমিতি গঠনে তরুণ বিপ্লবীদের প্রশিক্ষণ দিতেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এসব বক্তব্যকে অসত্য ও অসমর্থনযোগ্য মনে করেন।

এবার আসি গোয়েন্দা রিপোর্ট প্রসঙ্গে। রামকৃষ্ণ মিশন সংক্রান্ত সরকারি গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য গোয়েন্দা বিভাগের স্পেশ্যাল সুপারিনটেন্ডেন্ট চার্লস টেগার্ট-এর ১৫ মে ১৯১৪ তারিখের রিপোর্ট। এই রিপোর্টে টেগার্ট ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। টেগার্ট-এর মতে, বিবেকানন্দের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার উপর নিবেদিতার প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল। ঐ রিপোর্টে নিবেদিতা রচিত Kali the Mother ও Web of Indian Life গ্রন্থদুটিকে প্রচ্ছন্নভাবে রাজনৈতিক লেখা বলা হয়েছে। অবশ্য গ্রন্থদুটির বক্তব্য নিবেদিতার গুরু, স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা-ভাবনার প্রতিধ্বনি। রিপোর্টে নিবেদিতার সঙ্গে স্বামীজীর মতবিরোধের কথা বলা হয়েছে। এমনকি স্বামীজী তাঁকে রাজনৈতিক কার্যকলাপে যুক্ত হওয়ার জন্য ভর্ৎসনা করেছিলেন। টেগার্ট রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ স্পষ্ট ভাষায় নিবেদিতার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা উল্লিখিত হয়েছে।

রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে সরকারি বিদ্বেষ পরবর্তীকালেও অব্যাহত ছিল। ১৯১৭ সালের শেষদিকে প্রকাশিত জেমস্ ক্যাম্বেলকার রচিত Political Trouble in India 1907-1917 গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা কীভাবে তরুণ বিপ্লবীদের প্রভাবিত করেছিল তার উল্লেখ আছে। এমনকী ১৯১৫ সালে সরকার স্বামীজীর পত্রবলী গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। বিবেকানন্দের প্রভাবকে দোষারোপ করা হলেও নিবেদিতা সম্পর্কে কোনো বিরূপ মন্তব্য দেখা যায়নি। অবশ্য ইতিপূর্বেই ১৯১১ সালের অক্টোবরে নিবেদিতা প্রয়াত হন। ভারতের মাটিতেই তাঁর দেহাবসান হয়। ভারত হয়ে উঠেছিল তাঁর দেশের মাটি, পুণ্য স্বদেশভূমি।

তথাপি বলা যায়, নিবেদিতা বাংলার স্বদেশী যুগে

বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা দেখিয়েছেন। কলকাতার ইংলিশম্যান পত্রিকায় সরাসরি নিবেদিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ধরে। তবে স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক এস আর র‍্যাটক্লিফ ছিলেন নিবেদিতার চরম সুহৃদ। তাঁরা দুজনে বেনারসে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে (১৯০৫ খৃঃ) যোগ দেন।

বিপিনচন্দ্র পাল নিবেদিতাকে ভারতপ্রেমের জীবন্ত প্রতিমা বলে মন্তব্য করেছেন। ভারত ও ভারতবাসীর সঙ্গে তিনি একাত্মতা গড়ে তুলেছিলেন। কুসংস্কার, গলদ, বিদ্বেষ ঝেড়ে ফেলে তিনি ভারতবাসীকে ভারতাত্মার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাই তিনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের সার্থক উত্তরসাধক।

সরলা দেবী চৌধুরানি (১৮৭২-১৯৪৬)

সরলা ঘোষাল ছিলেন কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির দৌহিত্রী। মাতা স্বর্ণকুমারী দেবী আর পিতা জানকীনাথ ঘোষাল। তাঁর সাহিত্যপ্রীতি ও সাহিত্যসাধনার প্রেরণাদাতা ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। পিতা জানকীনাথ ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম আদিপুরুষ। তাঁর জাতীয়তাবাদী আদর্শ কন্যার মনে বাল্যকালেই প্রভাব ফেলেছিল। বেথুন কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতক হয়েছিলেন। এরপর চাকুরি জীবনে মহীশূর ও বরোদায় কিছুকাল অতিবাহিত করেন। কলকাতায় ফিরে এসে 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা হন। ভারতী-র পাতায় দেশপ্রেমের প্রতিফলনের পাশাপাশি কবিতা ও গানের মধ্যে দিয়েও সরলাদেবী জাতির প্রাণে দেশপ্রেম সঞ্চার করতে সচেষ্ট হন। ১৯০১ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁর 'হিন্দুস্থান' শীর্ষক জাতীয় সঙ্গীতটি মিলিত কণ্ঠে গাওয়া হয়। ঐ গানের প্রথম দুটি লাইনে বলা হয়েছিল—

অতীত গৌরবকাহিনী মম বাণী! গাহ আজ হিন্দুস্থান
মহাসভা উন্মাদিনী মম বাণী, গাহ আজি হিন্দুস্থান।।

ঐ গানে বঙ্গ-বিহার, উৎকল, মাদ্রাজ, মারাঠা, নেপাল, পাঞ্জাব, রাজপুতানা সকল অঞ্চলকেই একসূত্রে গাঁথতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু সরলাদেবী ছিলেন বীরাঙ্গানা। তাই শুধু স্বাদেশিকতার প্রচার নয়, দেশবাসীর মধ্যে পেশীশক্তি প্রসারে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ আহ্বান জানিয়েছিলেন, মানুষ চাই পশু নয়। বীরের মতো এগিয়ে চলতে হবে। সরলাদেবী 'ভারতী' পত্রিকায় (চৈত্র ১৩০৩ ব.) স্বামীজী সম্পর্কে লিখেছিলেন যে, বাংলার সামাজিক জীবনে

সরলা দেবী চৌধুরানি

নবযুগ বুঝি আসন্ন, বিবেকানন্দের মতো বীর সমাজের স্তূপীকৃত আবর্জনা দূর করতে পারবেন। কিন্তু সরলাদেবীর প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। স্বামীজী অকালে অমৃতলোকে চলে গেলেন।

কিন্তু স্বামীজীর ক্ষাত্রমন্ত্র সরলাদেবীর মনে যে আগুন জ্বালিয়েছিল, তা অচিরে রূপ পেল তাঁর নির্ভীক কর্মকাণ্ডে। প্রথমেই তিনি নিজেদের বালিগঞ্জের গৃহে একটি ব্যায়াম-কুস্তির আখড়া খুললেন। সরলাদেবীর আহ্বানে দলে দলে যুবক শক্তিচর্চায় যোগ দিলেন। এই আখাড়ার আদর্শে কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় শরীরচর্চার কেন্দ্র গড়ে উঠল।

এখানেই তিনি থামলেন না। শিবাজী উৎসব মারাঠা জাতির মধ্যে প্রবল উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল। অচিরে তা একটি জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়। লোকমান্য তিলক শিবাজী উৎসবের মাধ্যমে মহারাষ্ট্রে বলিষ্ঠ জাতীয়তাবোধের ভিত্তি স্থাপন করেন। বাংলায় এরকম বীরপূজার ব্যাপক আয়োজন করতে সরলাদেবী তৎপর হলেন। বাংলা ১৩১০ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে (মে ১৯০৩) কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় প্রতাপাদিত্য উৎসব ও উদয়াদিত্য উৎসব পালনের

মধ্যে বীরপূজার সূচনা হয়। এরপরেই নাট্যকার ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রতাপাদিত্য নাটক রচনায় সচেষ্ট হলেন। প্রতাপাদিত্য বাংলায় জাতীয় বীরের সম্মানে ভূষিত হলেন। তবে উদয়াদিত্য উৎসব বাংলার যুবসমাজে প্রভাব ফেলেছিল। রাজপুত বালক বাদলের মতো বাঙালি বালক উদয়াদিত্যও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন শুরু হওয়ার পূর্বে বাংলায় আত্মগৌরববোধ সৃষ্টি হয়েছিল।

তবে স্বদেশী ভাবনার প্রসারে আরও বেশি উল্লেখযোগ্য ছিল বীরাষ্টমী ব্রত। সরলাদেবী তাঁর আত্মজীবনী 'জীবনের ঝরাপাতা' গ্রন্থে এই ব্রত পালনের প্রেক্ষিত ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। বাংলার প্রধান উৎসব দুর্গাপুজোর অষ্টমীর আর একটি নাম হলো বীরাষ্টমী। সেদিনই বীরাষ্টমী ব্রত পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সরলাদেবী লিখছেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি মায়েদের বীরমাতা হওয়ার লক্ষ্যে নিয়ে আসা। মায়েরা ছেলের রক্ষাবন্ধন করে বীরোচিত কাজে উদ্দীপিত করার জন্য এই উৎসব পালিত হয়। জীবনের ঝরাপাতা থেকে জানা যায়, এই উৎসব সম্পন্ন হয় ১৯০২ সালের অক্টোবরে। উৎসবের শুরুতে একটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত কবিতা পাঠ করা হতো। ওই কবিতায় কৃষ্ণ, রাম, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অর্জুন, ভীম, মেঘনাদ, রানাপ্রতাপ, শিবাজী, রণজিৎ সিংহ, প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম প্রমুখ জাতীয় বীরের কথা উল্লেখিত ছিল। সরলাদেবীর মতো একজন তরুণী অবিবাহিতা মহিলার আচরণ সমাজের গোঁড়া মানুষেরা ভালোচোখে দেখেননি (সুমিত সরকার, 'দি স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল', পৃঃ ৩০৪-৩০৫)। এই বীরাষ্টমী ব্রত বেশ কয়েকবছর চলেছিল। প্রতাপাদিত্য উৎসবও কলকাতার বাইরে সাড়া জাগিয়েছিল। ময়মনসিংহ জেলায় সুহৃদ সমিতি প্রতাপাদিত্য উৎসব পালনে উদ্যোগী হয়। সরলাদেবী ওই সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। স্মরণে রাখা প্রয়োজন, ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে পাঁচশত পাতার দীর্ঘ গ্রন্থ রচনা করেন।

এদিকে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হওয়ার পর বাংলায় সমিতি বা সংগঠন গড়ে উঠতে শুরু করে। সরলাদেবী ও তাঁর আত্মীয় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার অনুশীলন সমিতির সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৫ সালে লাহোরে আর্য সমাজের বিশিষ্ট নেতা সমাজ সংস্কারক ও প্রসিদ্ধ আইন ব্যবসায়ী পণ্ডিত রামভুজ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে সরলাদেবী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। স্বামী রামভুজ পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায়ের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। পাঞ্জাবে বিপ্লব আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। সরলাদেবী স্বামীর রাজনৈতিক কার্যকলাপের পাশে এসে দাঁড়ালেন। ১৯১১ সালে সরলাদেবী ভারতের নারী সমাজের প্রগতি ও কল্যাণের জন্য 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল' নামে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। জাতীয় আন্দোলনে নারী সমাজের সক্রিয় ভূমিকার কথা ভেবেই স্ত্রী মহামণ্ডল সচেষ্ট হয়েছিলেন।

আলোচ্য লেখায় ভগিনী নিবেদিতা ও সরলাদেবী কীভাবে জাতীয় জাগরণে নিজেদের সঁপে দিয়েছিলেন তা দেখানো হলো। আর দেশের বাইরে একই সময়ে ভারতের মুক্তিসাধনার যজ্ঞে সমর্পণ করেছিলেন মাদাম ভিকাজি রুস্তম কামা, যিনি 'ভারতের বিপ্লববাদের জননী' নামে পরিচিত। প্রথমে লন্ডন ও পরে প্যারিসে তিনি ভারতের মুক্তি সংগ্রামের কাজে লিপ্ত হন। বন্দেমাতরম্ লেখা জাতীয় তেরঙ্গা পতাকা তিনি ১৯০৭ সালে স্টুটগার্টে এক সম্মেলনে উত্তোলন করেন। স্বদেশকে মাতৃভূমি বলা হয়। ভারতমাতার শৃঙ্খলমোচনে নারী-পুরুষ উভয়ের যৌথ প্রয়াস প্রয়োজন। নিবেদিতা ও সরলাদেবীর ঐতিহ্য অনুসরণ করেছিলেন সরোজিনী নাইডু, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, অমৃত কাউর, অরুণা আসফ আলি, লীলা রায়, বীণা দাস প্রমুখ মহিয়সী নারীরা।

ক্ষীরভবানী মন্দির।

স্বামীজীর চার তীর্থে কুমারী পুজো

জহর মুখোপাধ্যায়

এ কোন আলো লাগল চোখে। অপার্থিব এক আলোর দ্যুতি মহাবিশ্বের মহাশক্তি থেকে বার্তা নিয়ে পৌঁছে গেছে মানুষের হৃদয় থেকে হৃদয়ে। আশ্বিনের কাছাকাছি। ১৮৯৮ সালের আগস্ট। বর্ষা গিয়ে মিশেছে শরতে। শিউলি ঝরানো প্রভাতে অরুণ আলোর অঞ্জলি দেখে বেদান্তবাদী বীর সন্ন্যাসী বেরিয়েছেন প্রবজ্যায়। আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষকে সঙ্গে নিয়ে পদব্রজে চলতে শুরু করেছেন। কত রাজপথ জনপথ পায়ের তলা দিয়ে মুখ লুকিয়েছে। মরুভূমি সাগরের ঠিকানা খুঁজেছেন। ঘুরতে ঘুরতে কাশ্মীরে এসেছেন। প্রকৃতির চালচিত্রে শরতের লিপিখানি দেখে অভিভূত হয়ে পরম সৌন্দর্যময় শক্তি এক উপলব্ধি করলেন। রাজরাজেশ্বরী দেবী যেন চরাচর জুড়ে চেয়ে রয়েছেন। কাশ্মীর থেকে বারমুল্লায় পৌঁছে একটা 'সিকারা' ভাড়া নিলেন। নৌকার মাঝি আবার মুসলমান। মাথায় সুতোর টুপি। গালের দুপাশে দিয়ে ছুঁচালো দাড়ি বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে। পরনে ছোটখাটো লুঙ্গি আর হাফ হাতা ফতুয়া। মাঝির সঙ্গে তাঁর ছোট্ট একটি মেয়ে। বাপের সঙ্গে থাকে। বাপন্যাওটা। ভ্রমণার্থীদের নিয়ে নৌকাবিহার মাঝিদের একমাত্র পেশা। হাসি-আনন্দ বলতে কিছু নেই। জঠর জ্বালায় পুড়ে সব খাক্ হয়ে গেছে।

স্বামীজী এইরকম একটা নৌকা বেছে নিলেন। কাশ্মীরের অধিবাসীদের অনেকেরই জীবননাট্যের যবনিকা এই ভাসমান নৌকাগুলি থেকে তৈরি হয়। ছেলেমেয়ে বউ এমনকী পোষা কুকুরটি পর্যন্ত ঘর সংসারের কুশীলব হিসাবে উপস্থিত থাকে সেখানে। জল এবং জীবন সহাবস্থান যেখানে, সেইরকম একটি নৌকায় স্বামীজী যাত্রী হলেন। তাঁর দিকে এক পলক দেখে মাঝি নির্বিকার। নৌকায় লগি ঠেলে ঠেলে হরবকত মানুষ রতন দেখে ভালভাবেই চেনে। কার কত পকেটের দৌড় কথাবার্তায় বোঝা যায়। আরোহী যে এক গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। কাঁচা পয়সা পাবেন কোথায়! মনে মনে ভাবল।

স্বামীজী নৌকায় বসে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন। মধুর মূর্তি কাকে বলে আর। কিছুক্ষণ আগেই ভোর হয়েছে। নতুন দিনের আলো গাছগাছালির মাথার উপর দিয়ে মাটিতে এসেছে

With Best Compliments From :-

An ISO 9001 : 2008
certified Company

SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED

FOR ANY TYPE OF PILE FOUNDATION WORK
Cast-in-Situ Driven, Cast-in-Situ Bored, Precast Driven, Precast

AND
All Types of Engineering and Construction Works for Civil, Structural, Marine, Tankages, Piping Equipment Erection In

Regd. Office
"Simplex House"
27, Shakespeare Sarani, Kolkata-17
Phone (033) 2301 1600
Fax : (033) 2283 5964/65/66
E-mail : simplexkolkata@simplexinfra.net
Web. : www.simplexinfrastructures.com

Adm. Office
12/1, Nelllie Sengupta Sarani
Kolkata - 700 087
Phone (033) 2252 8371/8373/8374
Fax : (033) 2252 7595

BRANCHES

NEW DELHI MUMBAI CHENNAI

OVERSEAS BRANCHES

QATAR DUBAI BAHRAIN

নেমে। হঠাৎ ছোট মেয়েটির দিকে বিবেকানন্দের স্নেহদৃষ্টি ঝরে পড়ল কিংবা প্রশান্ত মুখের মেয়েটি তার দৃষ্টি টেনে ধরল। তাকে দেখে অধ্যাত্মবাদী স্বামীজী চোখ ফেরাতে পারলেন না। মেয়েটির সহজাত সারল্যে ভরা কচি মুখ আর চোখের আলোয় ভুবন ভরানো দেবীর জীবন্ত মূর্তি অনুভব করে বেদান্তবাদী তরুণ সন্ন্যাসী অন্তরে আগমনী বার্তা শুনতে পেলেন।

কাশ্মীরে স্বামীজীর সঙ্গে নিবেদিতা।

মানুষেরই জীবন্ত মূর্তির মধ্যে দিয়ে অঞ্জলি পৌঁছে দেবেন মহামায়ার পায়ে। কী আশ্চর্য! মেয়েটিও বুঝি তরুণ সন্ন্যাসীর তন্নিষ্ঠ আগ্রহ বুঝতে পেরে আনন্দে আপ্লুত।

হাতের সামনে উপাচার বলতে তেমন কিছু নেই। শুধু ভক্তিঅর্ঘ্য। মেয়েটি আশ্চর্যভাবে আবিষ্ট হয়ে এই অধ্যাত্ম পুরুষের আলোক বিচ্ছুরণ প্রতিমায় রূপান্তরিত হয়ে পুজো গ্রহণ করলেন। ভগিনী নিবেদিতার লেখায় এই ঘটনার যথার্থ উল্লেখ পাওয়া যায়।

তবে এই পুজো স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম কুমারী পুজো নয়। সে আর এক কথা। অন্য ঘটনা। ১৮৯০ সালে স্বামীজী মণিকা রায় নামে দশ বছর বয়সী এক কুমারী মেয়েকে দেবী হিসাবে হৃদপদ্মে আবাহন করেছিলেন। গাজীপুরের রায়বাহাদুর গগনচন্দ্র রায়ের মেয়ে মণিকা পরবর্তীকালে মা যশোদা নামে খ্যাত হয়েছিলেন। সেও এক ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাসেরও যে ইতিহাস থাকে সেকথা অনেকেই জানে না। গাজীপুরে অবস্থানের সময় প্রতিদিন স্বামীজী দরাজ কণ্ঠে গান শোনাতেন মণিকাকে। সুরের খেয়া বেয়ে চলে যেতেন তিনি সেই অধ্যাত্ম সাধনার পারাবারে। সেখানে দাঁড়িয়ে একাগ্রচিত্তে মনেপ্রাণে বিভোর হয়ে কুমারী মেয়েটির মধ্যে জগদ্ধাত্রী প্রতিমার অবস্থান উপলব্ধি করতেন। মেয়েটির বাড়ির লোকেরা এ ঘটনায় কিছুটা বা হতচকিত, বিভ্রান্তও বটে।

বিস্ময়ে বিচলিত হয়ে তাঁরা যথারীতি ভবিতব্যের কথা ভেবে পাত্রের সন্ধান করতে থাকেন এবং একসময়ে সাত পাকে বাঁধা পড়েন। স্বামীর নাম জ্ঞানেন্দ্র মোহন চক্রবর্তী। পরবর্তীকালে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন। শিক্ষাব্রতী হিসেবে খ্যাত হয়েছিলেন। কিন্তু দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তি ভালবাসা খুঁজতে গিয়ে সোনার হরিণ ধরতে চেয়েছিলেন। তাই বলে জীবনসঙ্গী চয়নে খুব যে একটা ভুল করেছিলেন এমন নয়। মেঘের ঢাকনা সরিয়ে একসময়ে চাঁদ যেমন পরিপূর্ণ ছটায় বিকশিত হয় ঠিক তেমনি একটা ঘটনা তাঁর জীবনে অর্থবহ হয়ে উঠেছিল। সংসারে জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যে থেকেও পরমার্থের পথ খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। কোথায় আছেন তিনি। কোথায় গেলে তাঁকে পাওয়া যাবে। বলতে পারে কে? তবু তাকে চেয়ে মনের দুয়ারে দাঁড়িয়েছিলেন। জুড়াতে চেয়েছিলেন জ্বালা যন্ত্রণা।

অবশ্য দাম্পত্য জীবনের গোড়ায় মণিকা নিজেকে এক পাকদণ্ডীর পথের দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। বাপের বাড়ির সুনাম এবং সম্মান বিসর্জন দিয়ে এক উচ্ছৃঙ্খল জীবনস্রোতের ঘূর্ণিপাকে নিমজ্জিত হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। খড়কুটোর মতো হয়তো সেদিন ভেসে যেতেন। কিন্তু না। আর একজনের ইচ্ছা সেরকম ছিল না। তার অদৃশ্য লেখনীতে কাহিনি বদলে গিয়েছিল। চন্দ্রাতপের মতো মণিকার মাথার উপর দিয়ে তিনি হাতের আবরণ দিয়ে রেখেছিলেন। রূপ থেকে রূপান্তরের দিকে যাত্রা শুরু হয়েছিল। পাকদণ্ডীর পথ পেছনে ফেলে এক নতুন রাস্তার মোড়ে এসে মণিকা দেখতে পেল এক দিব্য আলোর রশ্মি তার চলার পথে আগে আগে চলেছে। সংসারে থেকেও সংসার যে তাকে পরমার্থের পথ বলে দিয়েছে, সেই প্রাপ্তিযোগে অন্তরে বাইরে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

ঘর সংসার দাম্পত্য জীবনের রজ্জু আলগা করে প্রবজ্যায় বেরিয়ে পড়লেন মণিকা। আলমোড়া থেকে মিরটোলা দূরত্ব কিছু এমন নয়। তা হলেও মৌন প্রকৃতির কাছে গিয়ে অন্তরের ক্ষুধা উজাড় করে দিয়ে নিরন্তর নিজেকে খুঁজতে শুরু করলেন। এক আসনে বসে কতদিন কেটে গেল।

১৯২৮ সালের মাঝামাঝি ওইখানেই এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। লোকের মুখে মুখে মা যশোদা নামে পরিচিত হলেন। বালিকা মণিকাকে কুমারী দেবীজ্ঞানে পুজো করে তার মধ্যে সুপ্ত শক্তি জাগ্রত করে দিয়েছিলেন স্বামীজী। ঠিক সময়ে আবার সে এসেছে ফিরে। মনের একূল এবং ওকূল— দুকূল ভাসিয়ে ভক্তি এবং বিশ্বাসের জোয়ারে নতুন জীবনে প্রবেশ করলেন। বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে জগদ্ধাত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে নারী শক্তির উদ্বোধন দেখতে পেয়েছিলেন তিনি।

বেলুড় মঠে আনুষ্ঠানিক কুমারী পুজোর প্রচলন হওয়ার অনেক আগেই বিবেকানন্দ কুমারী পুজো করেছিলেন। মাত্র

বেলুড় মঠে কুমারী পূজা।

উনচল্লিশ বছর জীবন মেয়াদে বিবেকানন্দ চারবার কুমারী পুজো করেছিলেন।

১৮৯৮ সালের অক্টোবর মাস। স্বামী বিবেকানন্দ সেদিন ক্ষীরভবানীতে। স্বর্গের সৌন্দর্য যেখানে এসেছে নেমে। সেই ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরে। ভারতবর্ষের অতি পুরনো এক দেবীপীঠ এই ক্ষীরভবানী। হিমালয়ের নির্জন নিসর্গের বুকে এক প্রাচীন তীর্থে একটি ছোট্ট কুণ্ড আছে। সেই কুণ্ডের জলে দেবীর কল্পিত মূর্তির পুজো হয়। দেবী এখানে ভক্তের আবাহনে মানসপটে আবির্ভূতা হন। ক্ষীর অথবা পায়েস এই কুণ্ডে উৎসর্গীকৃত হয়।

এ হেন ক্ষীরভবানীতে এসে স্বামী বিবেকানন্দ যখন পৌঁছলেন তখন সবে সকাল। আকাশ ফাটিয়ে সূর্যের নবজন্ম ঘোষণা হচ্ছে। গাছে গাছে পাতার ফাঁকে পাখিদের নাচানাচি কিচির-মিচির প্রভাতবন্দনা। শান্ত প্রকৃতির পটে আঁকা ছবির মতো মৌনী হিমালয়। সহযাত্রী নিবেদিতা এবং দুজন গুরুভাইকে কাছেপিঠে রেখে বিবেকানন্দ বেরিয়েছেন ভ্রমণে। ঘুরতে ঘুরতে আবার সেই ক্ষীরভবানীর দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছেন। মুখ ফুটে কিছু তো চাইতে পারছেন না। শুধু চোখ ভেসে যায় চোখের জলে। মন্দিরের ভিতর থেকে যেন অনুচ্চারিত একটি কণ্ঠ শুনতে পেয়েছেন। কে যেন ডেকে বলছেন, ওরে আমার দুয়ারে দাঁড়িয়ে না থেকে ঘরের ভিতরে চলে আয়।

বিবেকানন্দ সেদিন নিজের হাতে পায়েসান্ন রান্না করে ক্ষীরভবানীর পুজো সম্পন্ন করলেন। সেই সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ বালিকার সামনে বসে কুমারী জ্ঞানে পুজো-আর্চা সম্পন্ন করলেন। অসমের কামরূপ কামাখ্যাতেও স্বামীজী কুমারী পুজো করেছিলেন। সেই পুজোর খবর পাণ্ডাদের পুরনো খাতায় এখনও রয়েছে। মহাকাল প্রহরীর দৃষ্টি উপেক্ষা করে স্বামীজীর হৃদয়ের বার্তা অনুসন্ধিৎসু মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি করে চলেছে। একথা শোনা যায় বিবেকানন্দ তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে কামাখ্যা মন্দিরে প্রচলিত প্রথানুযায়ী কুমারীপুজো সম্পন্ন করে কুমারীদের পেট ভরে খাইয়েছিলেন এবং নতুন বস্ত্রে ফুলে-ফলে আনন্দদান করেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ যতবার কুমারী পুজো করেছিলেন তার সবগুলিই যে শরৎ ঋতুর আবেদনে উদ্‌যাপন হয়েছিল এমন নয়। ঋতুভেদে সময় ভেদের ঊর্ধে উঠে যখনই জগন্মাতার ডাক শুনেছেন সাড়া দিয়েছেন তখনই। তবে একথা ঠিক, বেলুড়মঠের প্রথম দুর্গাপুজোয় বিবেকানন্দ নিজেও একজন সুলক্ষণা সরল মুখের কুমারী বালিকার পুজো করেছিলেন। মৃণ্ময়ী মূর্তিকে সামনে রেখে চিন্ময়ী আলোর পথ বেয়ে নিজেকে নিরন্তর খুঁজে বেড়িয়েছিলেন।

বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গাপুজো হয় ১৯০১ সালে। পুজোর মাত্র চার-পাঁচদিন আগের কথা। স্বামী ব্রহ্মানন্দ যখন গঙ্গাতীরে বসেছিলেন তখন তাঁর এক অদ্ভুত দর্শন অনুভব হয়। পূর্ণগর্ভা গঙ্গার এক প্রান্ত দিয়ে দক্ষিণেশ্বর হয়ে মঠের বেলতলায় এসে দশপ্রহরণধারিণী রিপুদলবারিণী যেন হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। ঠিক সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দও কলকাতা থেকে নৌকা করে মঠে এসে উপস্থিত হয়েছেন। মঠে পা দিতেই গুরুভাই ব্রহ্মানন্দের খোঁজ করলেন। কোথায় ব্রহ্মানন্দ? স্বামীজী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। চরাচর জুড়ে আগমনীর হাসি হাসি মুখ। জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে ঢাকের বাদ্যি শোনা যাচ্ছে। নিজের অন্তরের মধ্যে মাতৃ আরাধনার নিমন্ত্রণ পেয়ে বিবেকানন্দ তৎপর হয়ে উঠলেন। ব্রহ্মানন্দকে ডেকে বললেন, এবার মঠে প্রতিমা এনে পুজো করতে হবে। সব আয়োজন সম্পন্ন করো। বাঙালির বড় আদরের মেয়ে উমা। শুনে ব্রহ্মানন্দ ভাবলেন, এমন স্বপ্ন কখনও দেখেনি আগে— মাটিতে যে আজ স্বর্গ আসবে নেমে। কিন্তু সমস্যা হলো শেষ মুহূর্তে প্রতিমা পাবে কোথায়? কুমোরপাড়ায় পটুয়ারা নতুন করে অর্ডার হয়তো নেবে না। ব্রহ্মানন্দের কপালে চিন্তায় ভাঁজ

পড়ল। উপায় কী?

সেই সময় অলিগলিতে পার্কে অথবা মাঠে সাড়ম্বরে যত্রতত্র মুড়ি মুড়কির মতো সার্বজনীন দুর্গাপুজো হতো না। বনেদি বাড়ির ঐশ্বর্যের মধ্যে মা দুর্গা বন্দি হয়ে পড়তেন। ঘড়া ঘড়া টাকা ঢেলে জাঁকের পুঁজো ছিল বিলাসীবাবুদের ঠাটবাটের গরিমা। বারোয়ারি পুজো এক আধঘণ্টা হলেও তেমন জাঁকজমক ছিল না। মৃৎশিল্পীদের বাজার ছিল মন্দা। নির্দিষ্ট অর্ডার ছাড়া পটুয়ারা কাদা মাটি ছেনে সালাংকারা মাতৃমূর্তি সম্পন্ন করতেন না। সুতরাং মূর্তি জোগাড় করা খুব একটা সহজসাধ্য ছিল না। বলা বাহুল্য, ব্রহ্মানন্দ ব্যাপারটা ভালভাবেই জানতেন। মহামায়া সপরিবারে স্বর্গ থেকে রওনা দিলেও বেলুড়মঠে উদ্‌যাপনের নিশ্চয়তা ছিল না। তাই স্বামীজীর কাছে দুদিন সময় চেয়েছিলেন। স্বামীজী বলেছিলেন, তিনি মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন মঠে মাতৃ প্রতিমার পুজো হচ্ছে। ধূপ-দীপ আতরের গন্ধে ভাসছে। শঙ্খধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ফুলফলে ধন-ধান্যে ঢাক আর কাঁসরের বাজনায় মুখরিত হয়ে অসংখ্য অগণিত দর্শক এসেছে পুজো দর্শনে। নতুন বসনে সুসজ্জিত হয়ে স্নিগ্ধ শুচিমনে পুজোর ডালি হাতে নিয়ে ভিড় করেছেন ভক্তগণ। একথা শুনে মঠবাসী গুরুভাইয়েরা আনন্দে জেগে উঠলেন। হইচই পড়ে গেল। এ যেন এক বিপুল প্রাণের উদ্বোধন। কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী ছুটলেন কুমোরটুলির দিকে। একটা প্রতিমা চাই। দেবীমূর্তি, মাটির আবরণ থেকে বেরিয়ে এসে ভক্তের মানসপটে যিনি আবির্ভূতা হয়ে সাড়া জাগিয়ে দেবেন। বিশ্বজননীর প্রতীক। আশ্চর্য! কুমারটুলিতে সেদিন একটাই প্রতিমা ছিল। সাজসজ্জা সম্পূর্ণ করে প্রতিমাখানি যেন কারও অপেক্ষায় ছিল। হয়তো কারও বায়না দেওয়া প্রতিমা। হয়তো কোনো কারণে সেটিকে পুজোর স্থানে নিয়ে যেতে পারেনি। তা হলেও ওই প্রতিমা অরূপ রূপের রাগে স্থায়ী ঠিকানা খুঁজে পেল বেলুড়মঠে।

কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী আর পাঁচজন গুরুভাইকে সঙ্গে নিয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে মহানন্দে চিৎকার করে বললেন, দুর্গা মাইকী... মা চলেছেন নিজ বাসভূমে। সপার্ষদে সাড়ম্বরে। ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনিতে আকাশে বাতাসে আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল। গুরুভাইয়েরা ধরাধরি করে বেলুড়মঠে প্রতিমা নিয়ে এলেন। মনে হলো কত আপনজন। এত কাছে পেয়ে আরও কাছে চাওয়ার আকুতি। রাজরাজেশ্বরী দেবী অন্তরের আবাহনে যেন সাড়া ফেলে দিয়েছেন। বেলুড়মঠে প্রথম পুজোর বাদ্যি শোনা গেল।

SOCKS FOR STYLE DOWN TO YOUR FEET

BARUN®

EXCLUSIVE SOCKS

Quality Products

B. K. International (P) Ltd.

A-125/1, Wazirpur Industrial area

DELHI-110 052

Phone : 2785-7039, 2737 6113 । Fax No.: 2785 7066

With Best Compliments from-

A
Well
Wisher